নেহরু বাল পুস্তকালয়

সে অনেক কালের কথা

(প্রথম খণ্ড)
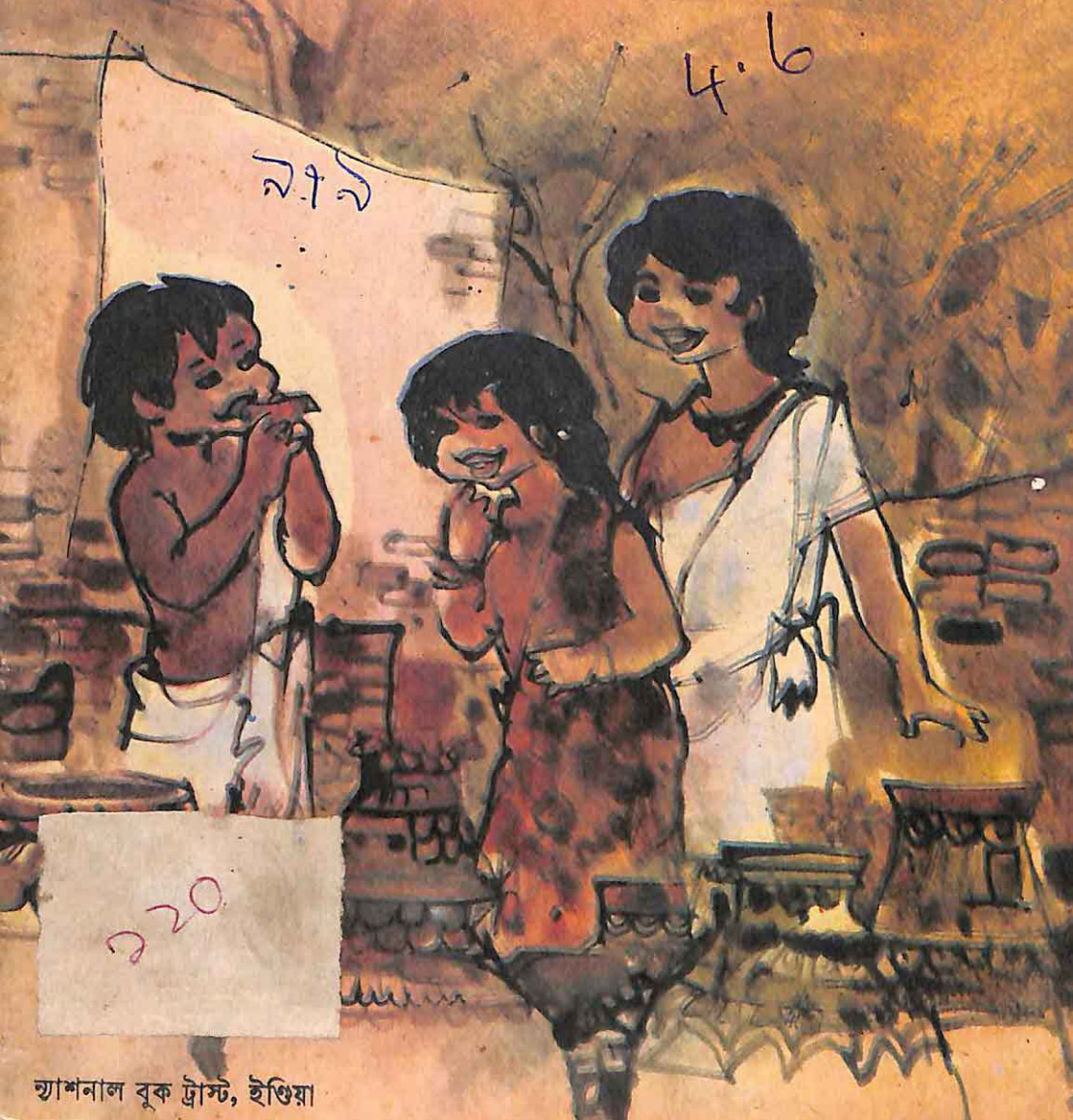
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সে অনেক কালের কথা

(প্রথম খণ্ড)

রচনা : এম. চোকসী ও পি. এম্. যোশী

অনুবাদ : প্রসূন মিত্র

চিত্রাঙ্কন : পুলক বিশ্বাস
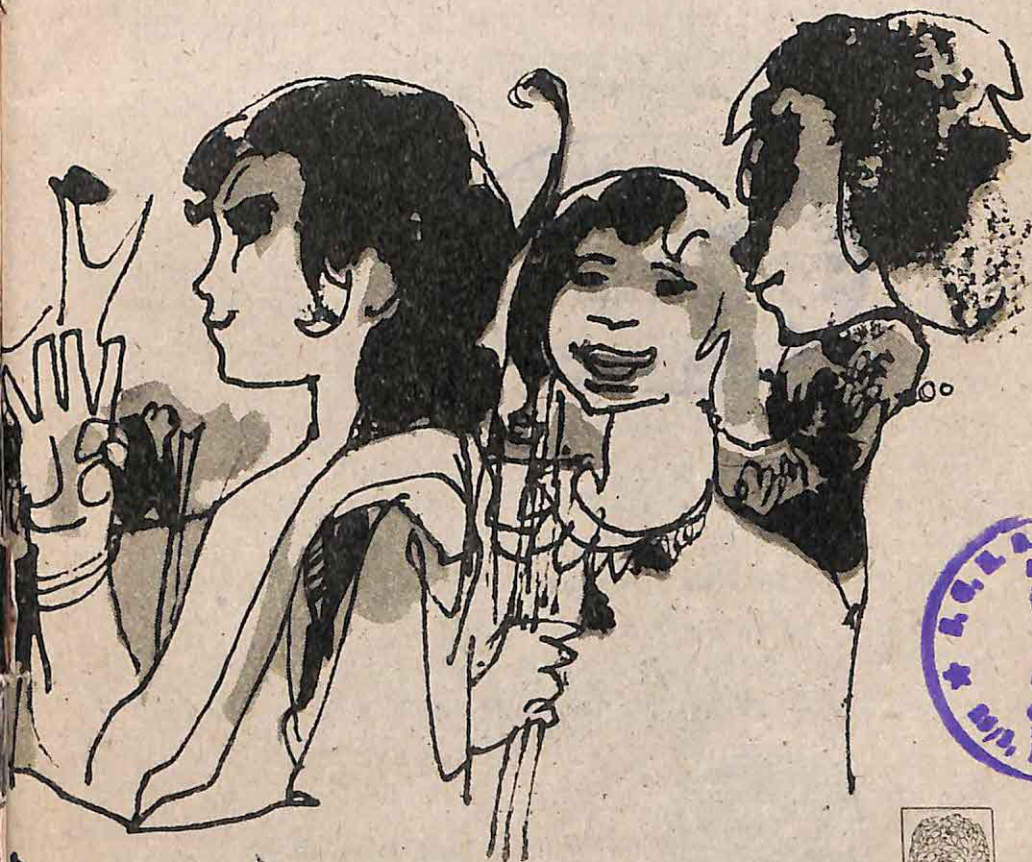
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

প্রাচীনপুরী—মোহেন্‌জোদারো

বোশেখ-জষ্টি মাস। দুপুরবেলার খর রদ্দুরে মোহেনজোদারো শহরের বাড়িঘর তেতে উঠেছে। সারি সারি সাজানো, ইটের বাড়ি, মাথায় সমতল ছাদ। কোনো বাড়িতেই জানালা নেই। বাড়ির মাঝখানে মস্ত উঠোন। সব ঘরের দরজাই উঠোন-মুখী, দরজা খুললেই আঙিনায় এসে পড়বে। উঠোনের চাতালে বসে বাড়ির মেয়েরা কুটনো কোটে, বাটনা বাটে, ধানচাল সেদ্ধ করে, বাসনকোসন মাজে ধোয়। তারপর ঘর-গেরস্তালীর কাজ সারা হ'লে উঠোনে বসেই গল্প করে আর সুতো কাটে। মা মাসীরা গল্পগুজব করে, ছেলেমেয়েরা তাদের আশেপাশে খেলাধুলো করে। চাতালের এককোনে এবড়োখেবড়ো করে খোঁড়া খানিকটা জায়গায় ছক্ কাটা, ওখানে ছেলেরা নানান রকম খেলা খেলে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাত আরো প্রখর হয়ে উঠছে। উঠোনেও আর এখন তেমন ছায়া নেই। শীলমোহর বানানোর কারিগর বিরোচন তার কারখানা ঘরেই একখানা মাদুর বিছিয়ে গড়িয়ে নিল, একটু ঘুমোবে। তার বউও এখন একটু ঘুমোচ্ছে। রান্না খাওয়ার পাট সারা। খাটা-খাটুনির পর একটু জিরোনো দরকার। দুপুরে রান্না হয়েছে ভাত, যবের আটার রুটি আর তরকারী। সারা বাড়ির লোক খাবার আগে রোজই স্নান করে, আজও করেছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও এখানে জলের অভাব হয়না। শহরটা গড়ে উঠেছে একটা বিরাট বড় নদীর পাড়ে। এই নদীকেই আজকাল আমরা সিন্ধুনদ বলে জানি।

বড়রা ঘুমোলে, ছেলেপুলেরা তখন কাজে-কর্মে মেতে ওঠে। বিরোচনের ছোট ছেলে হিরাপ, বাবার কারখানা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সাজিমাটির ডেলায় ঘরটা ভর্তি হয়ে আছে। সাজিমাটি খড়ির মতন একরকম জিনিস। বিরোচন সাজিমাটির ডেলাগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রেখেছে,

কোনোটা চৌকো, কোনোটা একটু লম্বাটে—সব কটা টুকরোই চ্যাপটা আর তলাটা সমান। এই টুকরো গুলোকে আবার নানান জীবজন্তুর আকারে কাটা হয়েছে, আর তার নিচে নিচে ছবির হরফে কী সব লেখা। এইগুলোকেই সীলমোহর বলে। সওদাগরেরা, আরো নানান পেশার লোকেরা সবাই এই মোহর দিয়ে ছাপ দেয়, এইগুলো তাদের নিজেদের আলাদা আলাদা পরিচয়ের চিহ্ন। শহরে-কুমোর, ইটের মিস্তিরি, তাঁতী, সেকরা, তামার কারিগর, নৌকোর কারিগর, পাথরের মিস্তিরি, এইরকম নানান শিল্পী-কারিগর আছেন, কিন্তু শীলমোহরের শিল্পীরই কদর বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কারণ প্রায় প্রত্যেকেরই নিজের নিজের মোহর দরকার হয়।

বিরোচনের দোকানের খুব নাম ডাক। এমন অনেক সওদাগর আছেন যাঁরা নিপুণ কারুকার্যের জন্যে চড়া দাম দেবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁরা বিরোচনের বাঁধা খদ্দের। জীবজন্তুর নকসা তাঁরা সবাই বেশ পছন্দ করেন। নকসা কাটা শীলমোহরে বোঝাই বিরোচনের কারখানা ঘরটা যেন একটা ক্ষুদে চিড়িয়াখানা। সেখানে সব জন্তুই পাওয়া যাবে। এতখানি চওড়া কপাল হাতীর ছাঁচ-দেখলেই বোঝা যায় হাতীর খুব বুদ্ধি, লম্বা শিংওয়ালা জমকালো ষাঁড়, ডোরাকাটা বাঘ তাছাড়া আরো এমন সব জানোয়ার যা কিনা কেবল জোলো আর গরম আবহাওয়ার দেশেই দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ধর, এক-শিঙেল গণ্ডার, যা জলা ডাঙায় থাকে কিংবা ধর কুমীর জলেই যার বাস—এই সব হরেক রকম জন্তুজানোয়ারের ছাঁচে বিরোচনের দোকান ঘরখানা ঠাসা।
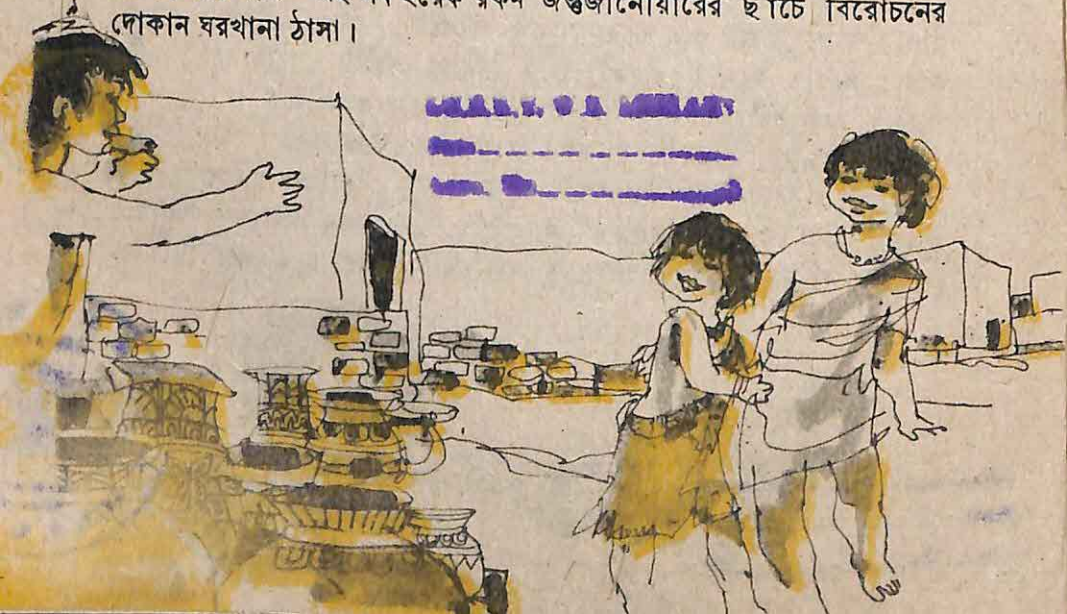
ডাঁইকরা জঞ্জাল আর ঝড়তি পড়তি জিনিসের মধ্যে থেকে হিরাপ একখণ্ড সাজিমাটি কুড়িয়ে নিলে। তারপর একখানা ক্ষোদাই করবার ছুরি খুঁজতে লাগল। দেয়ালের গায়ে গাদা করা মেটে জালা আর কলসি, তার ভেতর রাজ্যের টুকিটাকি জিনিস। ঘরের এককোনে রাশিকৃত ঝকঝকে ছুরি, ক্ষুর আরও নানান অস্তর—এসবই ক্ষোদাইয়ের যন্ত্রপাতি। ছুরি, ক্ষুর, অস্ত্রশস্ত্র সব যন্ত্রপাতিই তামার তৈরী। আমরা পাঁচ হাজার বছর আগের কথা বলছি। তখনও লোকে লোহার ব্যবহার জানত না।

হিরাপ সবে ক্ষোদাই শুরু করতে যাচ্ছে এমন সময় তার ছোট্ট বোনটা কেঁদে উঠল। তার খেলনা পাখিটা হাত ফসকে স্নানঘরের নর্দমায় পড়ে গেছে।

হিরাপ বললে, "কাঁদিস নি, আমি তোকে আর একটা পাখি এনে দেব'খন। কুমোর কাকার ছেলে ঝাঁঝর আমার বন্ধুতো, আমি এখুনি ওদের বাড়ি যাচ্ছি। চল্ আমার সঙ্গে। ওর বাবা কতকী খেলনা বানাবে, দেখবি চল্।"

সন্দীপন দাদার হাত ধরল। দুই ভাইবোন রাস্তায় হাঁটতে লাগল। রাস্তা সরু, কিন্তু সোজা, বাঁকাচুরো নয়, আর তকতকে পরিষ্কার। নদীর দিক থেকে এক ঝলক ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে বড় রাস্তাটা আর তার লাগোয়া গলিগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে গেল। সবকটা গলিই আড়াআড়ি সড়কের গা দিয়ে বেরিয়েছে। ওরা এবার আর একটা গলিতে ঢুকল। এটা কুমোর পাড়ার গলি, শহরের কুমোরেরা সবাই এই পাড়ায় থাকেন, এখানেই কাজ করেন। কুমোরেরাও বেশ অবস্থাপন্ন কারিগর। মেটে জালা আর কলসির চাহিদা প্রচুর। ভাঁড়ারে-গুদোমে মালপত্র জমা করে রাখার পাত্র বলতে জালা-কলসিই প্রধান।

ওরাও গেছে আর ঝাঁঝরও তক্ষুনি তার বাবার কারখানা থেকে বেরোল। তাকে দেখেই সন্দীপন চেঁচিয়ে উঠল—"ঐযে, ঐ দেখ আমার পাখিটা, ও মুখে পুরেছে।" ও এইকথা বলছে, ওদিকে ঝাঁঝরের মুখে বাঁশি বাজছে। হিরাপ আর সন্দীপন একছুটে ঝাঁঝরের কাছে গিয়ে

হাজির। ঝাঁঝরও বেশ জাঁক করে তার বিশেষ ধরণের বাঁশিটি ওদের

দেখাল। সব ছেলেদেরই যেমন পোড়ামাটির নল দিয়ে বানানো বাঁশি থাকে তেমনই, আলাদা কিছু নয়—খালি এর গড়নটা পাখির মতন।

দোরের কাছে কার গলা শোনা গেল- ঝেবর। ঝেবরের কাকা বড় সওদাগর। তাঁর খুব পসার। দেশ বিদেশে তাঁর কারবার। ঝেবর বেশ জাঁক করেই বলতে লাগল—"কাকা সেকরাদের দিয়ে যা সব একএকটা চমৎকার চমৎকার হার গড়ায় না, সে দেখবার জিনিস, যদি দেখিস না……। কাকা ঐসব হার নিয়ে অনেক দূর দূর দেশে যায়। অনেক দূরে এইরকম একটা নদীর ধারের দেশ আছে (মিশর), সেখানকার লোকে মরুভূমিতে বিশাল পাথরের মিনার গড়ে। সে দেশের মেয়েরা তাঁর সোনার হার পরতে খুব ভালবাসে। আর তাদের মহারাণী মানে তাদের রাজা ফ্যারাওয়ের বউও ঐ হার পরেন। সেসব হ'ল 'আসল' হার, বুঝলি!" ওর কথা শুনে হিরাপ আর ঝাঁঝরের বেশ রাগ হ'ল। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলে, "কাঠ, পাথর আর

পুঁতির মালাও সোনার হারের মতনই সুন্দর দেখতে।”

ওদের উঁচু গলা শুনে ঝাঁঝরের মা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে সাদাসিদে সুতী ঘাঘরা, হাতে তামার তাগা, মণিবন্ধে তামার বালা। তাঁর চুল চুড়ো করে বাঁধা, তাতে সুন্দর কাঁটা আর চিরুনি গোঁজা। কোমরে ব্রোচ দিয়ে পরনের মেখলা বেশ আঁটো করে বাঁধা। গলায় ক্ষোদাই করা পাথরের পুঁতির মালা, পুঁতির কতকগুলো গোল, কয়েকটি চোঙার গড়ন।

ঝাঁঝরের মা নরম সুরে বললেন, “আমাদের কারিগরেরা বেশ চালাক, তাই না? তাঁরা দামী দামী পাথর দিয়ে আর সোনা দিয়ে হার গড়েন নানান দেশের বড়লোকদের কাছে বিক্রী করার জন্য। আবার কাঠ-পাথর ক্ষুদে যেসব হার তৈরী করেন, তাও খুব সুন্দর। আর সেসব আমরা সব্বাই পরতেও পারি।”

ঝেবর তার কথার খেই ধরে বলে, “কাকা কাপড়ও বিক্রী করেন। সওদা নিয়ে কাকা সমুদ্দুর দিয়ে রওনা হন। আমাদের জাহাজ পুন্তের বন্দরে গিয়ে ভিড়তে না ভিড়তেই, ওখানকার সওদাগরেরা একেবারে ঘিরে ধরে আমাদের গয়নাগাঁটি আর মোলায়েম সুতীর কাপড় কিনবে বলে। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা সবাই আমাদের মিহিসুতোর কাপড়ের জামা-কাপড় পরেন। আর শুধু যে বেঁচে থাকতেই পরে, এমন নয়, মারা যাবার পরেও পরেন।” ঝাঁঝর বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলে—“তোর যত বড় বড় কথা, ঝেবর।” হিরাপ মাঝে পড়ে বললে, “না, কথাটা ও ঠিকই বলেছে রে। ওদেশের লোকের এক আজব রেওয়াজ। আমার কাকাও সেদিন বলছিলেন, ওখানে কোন বড় মানুষ মারা গেলে, ওরা তার দেহটা রেখে দেয়। নরম কাপড়ে মুড়ে, বালি কিংবা পাথরে বিরাট করে কবর খুঁড়ে তার মধ্যে দেহটা রেখে দেয়। ওদের কথার মাঝখানেই সন্দীপন হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—“আমি সোনার হার দেখব।”

“তা কী করে হয়?” ঝেবর বলে, “সোনার হার তো সেক্‌রার দোকানে ছাড়া আর কোথাও দেখতে পাবে না। ওসব জিনিস হ’ল বড়লোকদের জন্যে। কাকা বিক্রী করেন, কিন্তু এখন তো আর বাড়িতে নেই।”

ঝাঁঝর জিজ্ঞেস করল, “সোনা কোথায় পায়? আমাদের শহরের ধারে-কাছে তো সোনা নেই।”

এর জবাব দিলেন তার মা, বললেন, "যাওনা, একছুটে নৌকোঘাটায় গিয়ে কপার্দীকে জিজ্ঞেস করে এস। তার নৌকো এই সবে ঘাটে ভিড়েছে। তার কাছেই জানতে পারবে কোন জিনিস কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়।"

হিরাপ বলল, "আমাকে আগে সন্দীপনকে বাড়ি দিয়ে আসতে হবে।"

ঝাঁঝরের মা বললেন, "ও থাকুনা আমার কাছে। ঝাঁঝরের বাবা নতুন খেলনা বানিয়েছেন, তাই নিয়ে খেলবে। তারপর আমিই ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব'খন। একটা খাঁচায় একটা ছোট্ট এতটুকুন পাখি আছে, ওর দেখলেই ভাল লাগবে। আর একটা গাধা আছে, তার দড়ি ধরে টানলেই ঘাড় নাড়ে।" শুনেই সন্দীপন আহ্লাদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একসা—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি দেখব।"

হিরাপ তো এককথায় রাজি। বললে, "বাড়ি অব্দি যেতেও হবে না। গলির মোড়ে ওকে এগিয়ে দিলে ও ছুট্টে বাড়ি চলে যাবে।" ঝাঁঝরের মা কথা দিলেন। বললেন, "তাই হবে। ও যতক্ষণ না বাড়ির ভেতর ঢোকে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব'খন। আর আমাদের রাস্তায় দাঁড়ালে তো এমুড়ো থেকে ওমুড়ো দেখা যায়।" ছেলেরা হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল। তাঁতীপাড়ার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওরা তাঁতীর ছেলেকে ডাক দিল। সে তখন একটা বিরাট বড় তাঁতশালায় দাঁড়িয়ে তার বাপের তাঁতে সুতো বোনা দেখছিল। ওদের ডাক শুনে দৌড়ে বেরিয়ে এসে ওদের সঙ্গ নিল।

ওরা শহর ছাড়িয়ে, যবের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, গমের ক্ষেত পেরিয়ে এগিয়ে চলল। গ্রামবাসীরা এইসব গম-যবের চাষ করে। তারা মাটির কুঁড়ে ঘরে থাকে।

মাঝে মাঝে ইটের ভাঁটা, খোলা চুল্লীতে ইট পোড়ানো হ'চ্ছে।

ওরা হাঁটছে, পাশের রাস্তা থেকে একটা মোটা মতন ছেলে ওঁদের চেঁচিয়ে ডাকল। পুরুত ঠাকুরের ছেলে বৃহদ্রথ। সে বেচারা সব সময় ওদের খেলায় যোগ দিতে পারেনা। তাকে দিনে অনেকবার চান করতে হয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা মন্ত্রজপ করতে শিখতে হয়। তার ওপর তার বাবা তাকে প্রায়ই বাড়ি বাড়ি পাঠান, পূজো পার্ব্বন এলে লোককে আগেভাগে খবর দিয়ে আসতে হয়।

বৃহদ্রথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "তোরা কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া আমিও যাব। অত ছুটছিস কেন? খেয়ে উঠে অত জোরে হাঁটা ভাল নয়।"

"কী বললি? খেয়ে উঠে! তুই এখন আবার খেতে বসেছিলি?" ওর বন্ধুরা ওকে চটাবার জন্যে বলে।

"খাবই তো, খাবনা তো কিরে," বৃহদ্রথ চটে উঠে বলল।

"আমার তো আর তোদের মতন নয়। আমায় চান করে উঠে জপ করতে হয়, মন্তর পড়তে হয়, তবে তো খাওয়া। আমার দুপুরের খাবার খেতে অনেক দেরী হয়। তোদের অনেক পরে আমি খাই।"

ঝাঁঝর বললে, "খাস্ ও তেমনি পাহাড়ের মত এককাঁড়ি।" বৃহদ্রথ জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে জবাব দিল, "খেজুরের মোরব্বা দিয়ে বারোখানা যবের রুটি খেলুম।" তারপর হিরাপের দিকে ফিরে বললে, "যাই বলিস, যত খেজুর খেয়েছি, তার মধ্যে তোর কাকার আনা জোড়া নদীর দেশের (য়ুফ্রেটিস-টাইগ্রিস) খেজুরই সেরা।" তারপর একটু থেমে, ব্যাকুল সুরে "তোর কাকা তো আবার শীগ্যিরি ফিরবে না রে?"

হিরাপ হাসতে হাসতে বলল "হ্যাঁ। খেজুর আনলে তোকে দিয়ে যেতে ভুলবনা। নৌকো তো সব বর্ষাকালের আগেই ফিরে আসবে। কাজেই কাকাও ফিরে এলো বলে।"

নদীর ধারে বালিয়াড়ির ওপর নৌকো বানানোর বিরাট চত্বর। ছেলেরা এবার সেই দিকে এগোল। এশহরের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব ফলাও; অনেক দূর দূর দেশের সঙ্গে কারবার। তাই, কি সাগরপথে কি ডাঙাপথে যাতায়াত যানবাহন-চলাচল লেগেই আছে। কেবল বর্ষার ক'টা মাস ছাড়া সারা বছরই নৌকা আনাগোনা করে। বড় বড় ভারী ভারী বজরা নৌকো; সেসব নৌকোর উঁচু গলুই ঢেউয়ের নাগালের বাইরে। কোনো কোনো নৌকোয় পালও আছে। নাবিকেরা (মাঝি-মাল্লারা) দিনের বেলায় সূর্য, আর রাত্তিরে ধ্রুবতারা দেখে দিশা ঠাওর করে। তারা কূল ঘেঁসেই চলে; নইলে পরপর কদিন ক'রাত মেঘলা হ'লে পথ ভুল হয়ে যেতে পারে। একবার ডাঙা থেকে বেশি দূরে গিয়ে পড়লে একেবারে হারিয়ে যাবার ভয় থাকে।

জাহাজঘাটায় যেতেই ছেলেরা তাদের বন্ধু কপার্দীর দেখা পেয়ে গেল। কপার্দী ভারী অমায়িক স্বভাবের মানুষ; সর্দার মাঝি। অনেক ঘুরেছেন, জানেন শোনেন ঢের। দেশ বিদেশের নানান গল্প করে তিনি ছেলেদের বুঝিয়ে দিলেন, কোন মনোহারী জিনিসটি কোন্ দেশ থেকে ভেসে আসে। বললেন, সোনা আসে অগ্নিকোণের দেশ (আজকের মহীশূর) থেকে আর একধরণের চোখজুড়োনো সবুজ পাথর আসে দক্ষিণ দেশ থেকে। আর একরকম উজ্জ্বল নীল পাথর পাওয়া যায়; সেই পাথর আনতে উটের মিছিল নিয়ে বহু বাধা বিপদ পার হয়ে সেই সুদূর উত্তরের দেশে— (আফগানিস্তান) পাড়ি দিতে হয়। সে জায়গায় যেতে পথে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়-পর্বত পার হতে হয়, সেই সব পাহাড়ে বিশাল দেহ ভালুক আর আরও কতরকম বন্য জন্তুর আস্তানা।
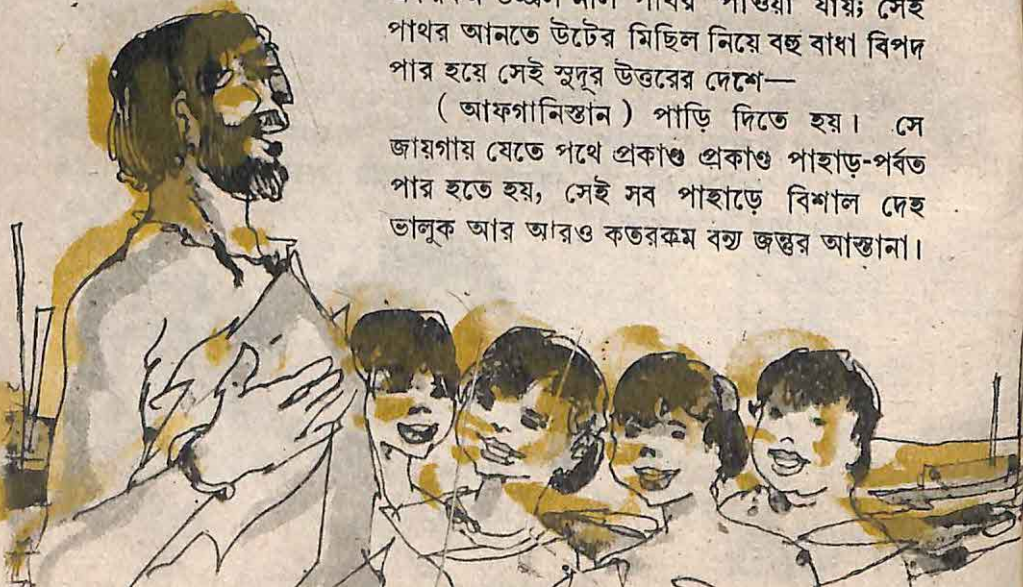
তবে কপার্দী নিজে অনেকবার দূর দূর দেশে নৌকো পাড়ি দিয়েছে। আর এক নদী উপত্যকার ইটের শহরে (য়ুফ্রেটিস-টাইগ্রিস) গেছে দীর্ঘ জল পথ পেরিয়ে। সেরা খেজুর আসে ঐ শহর থেকে। তার চেয়েও দূরে আরো এক সৈকত-সভ্যতার দেশ (মিশর) আছে। সে-দেশে বড় বড় পাথরের প্রাসাদ। সে দেশের নগর বা গ্রামগুলো সব নীলুস নদীর পাড়ে। কিন্তু ও দেশটার যেজন্যে এত নাম ডাক সেই পাথর মিনারগুলো সবই হল গে দূরে মরুভূমির ভেতরে। ঝেবর করুণ সুরে জিজ্ঞেস করলে, "ওসব শহর কি আমাদের শহরের চেয়ে বেশি সুন্দর?"

কপার্দী মুচকে হাসলেন। বললে, "তাদেরও অনেক কিছু দেখবার আছে, আমাদেরও অনেক কিছু দেখবার আছে। তবে একটা কথা বলি শোন। এই যে এক একটা লম্বা জলযাত্রা সেরে ফিরি। ফিরেই কী করি জান? আমাদের সার্বজনিক স্নানাগারে গিয়ে খুব ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে গা রগড়ে গরম জলে চান করি। এই আরামটি আমি আর কোনো দেশে পাইনি।" "কেন?" ঝাঁঝর অবাক, "ওসব দেশের লোকে কি চান করেনা, নাকি?"

অনেকক্ষণ পরে হিরাপ এবার মুখ খুলল। বলল, "ওরা অমন বাড়ি বাড়িতে চানের ঘর কোথায় পাবে? আর এমন চমৎকার বারোয়ারী স্নানের জায়গাতো নিশ্চয়ই ওদের নেই!" তার গলায় বেশ গর্ব ফুটে উঠছিল।

কপার্দীকে আরো একটু বুঝিয়ে বলতে হল। বললেন, "শহরের পথ-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে, শহরের সমস্ত নোংরা জল বয়ে যেতে পারে এমন নালী কাটা দরকার তো? তা করতে গেলে, মাটির নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পোড়া ইটের তৈরী পাকা গাঁথুনির নল আর পাকা নালা নর্দমা বানাতে হয়। এই বন্দোবস্ত অন্য দেশে নেই। এই আর কি। জোড়ানদীর শহরে, ওরা ইঁটের তৈরী খুব উঁচু মিনারের চুড়ো বানিয়েছে, সেখান থেকে নক্ষত্র দেখে। নীলনদের দেশে পাথরের বড় বড় স্মৃতিস্তম্ভ মরুভূমির বালির মধ্যে মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে আছে। দেখলে মনে হয় চিরকাল অমনি থাকবে। তবে আমাদের শহরের যেমন ভাল বন্দোবস্ত, এই রকমটি আর পৃথিবীর কোথাও নেই। এমন ঝকঝকে তকতকে, আর এমন সবদিক দিয়ে ভালো ব্যবস্থা, এমন শহর আর কোনো দেশে দেখিনি।"

ভীমক আর তার বন্ধুরা

মহাকাব্য 'মহাভারত' যে যুগের ঘটনা নিয়ে লেখা, আমরা এখন সেই যুগের কথা বলছি। আর্য বলে একটা যাযাবর জাতের লোক, ইতিমধ্যে মহেন-জো-দারো থেকে, সেকালের আদি সিন্ধু উপত্যকার নগরবাসী বণিক মানুষদের হটিয়ে দিয়েছে। আর্যরা পশুপালন পশুচারণ নিয়েই থাকত।

তারা গরু, ভেড়া পুষত, ্যাত। তাদের গরু ভেড়ার পালনের সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত। চাষ করতে জানত খালি ভুট্টা।

যমুনা নদীর তীরে বারণাবত বলে একটা জায়গা। জায়গাটা যেমন উর্ব্বর, তেমনই প্রচুর জল, ছায়া-ঘেরা বন আর পশুচারণের উপযোগী বড় বড় ভাল ভাল মাঠ। বনের সীমানায় একটা গ্রাম। সে গ্রামে কয়েকটি কুটির। শুধু মাটি আর বাঁশ দিয়ে বাঁধা। সারি সারি কুটির ক'টি কাঁটা-গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রথের সারথির ছেলে ভীমক, তার মা আর তার ছোট বোন দেবীকে নিয়ে এই মেটেকুড়েতে থাকে। তার বাবা কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে মারা গেছেন।

ভীমক খুব ভোরে ওঠে। এখানে সকলেরই তাই অভ্যেস। ভীমক তীর ধনুক চালানো (ধনুর্বিদ্যা) শিখছে। শিক্ষার্থী হিসেবে তার সঙ্গীদের মধ্যে সবাই তাকেই সেরা বলে ভাবে। আর বছর কয়েকের মধ্যেই সে রথ চালাতে তো শিখবেই, এমনকি রথ বানাতেও শিখে যাবে। তার ইচ্ছে, বড় হয়ে বাপের মতন বড় সারথি হবে। রাজার সেরা সারথিদের একজন হবে।

সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। সকাল বেলার কাজ সারা। ভীমক নদীতে স্নান করে বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে খেলতে গেল বনের দিকে। তার সঙ্গী হল রাখাল ছেলেরা, কুমোর, তাঁতী আর সেকরার ছেলেরা। ওরা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে। সে খেলায় ভীমক সব সময়েই সরদার হয়, কারণ তার বাবা লড়াইয়ে মারা গেছেন। ভীমক তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নানা ধরণের ব্যূহ সাজায় কখনো চারকোনা কখনো আয়তাকার, কখনো বা মাকড়সার জালের মত গড়ন। দড়ির সিঁড়ি, ফাঁস, রণ কুঠার এসব নিয়ে মাঝে মাঝে দুর্গ দখলও হয়। এসব খেলার হাতিয়ার নিজের হাতে বানাতেই ভীমক ভালবাসে। লম্বা লম্বা ছড়িকে বেশ শান দিয়ে ঝকঝকে করে, ধারালো করে সেগুলোকে বল্লম বানায়। মোটা আর খাটো খেঁটে লাঠির মুখে ছুঁচলো পাথর বেঁধে কুঠার বা পরশু বানায়। রণকুঠার ওর খুব প্রিয় অস্ত্র। লাঠির গায়ে পাথর বাঁধার সময়ে ও খুব সযত্নে চামড়ার ফিতেয় শক্ত বাঁধন দিয়ে বাঁধে—যাতে বাঁধন এমনিতেই আঁটো হয়, তার ওপর পরে চামড়া শুকিয়ে আরো আঁট হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে দস্যু-ছেলেরা খেলায় হাজির হয়। তারা এলেই খেলার লড়াই বেশ গুরুতর আকার নেয়। দস্যুরা মাথায় খাট, গায়ের রঙ কালো।

দীর্ঘাকৃতি, ফর্সা। আর্যদের তারা এড়িয়ে চলে, কাছাকাছি থাকেনা। ওদের যুদ্ধে হারিয়েই আর্যরা এদেশ দখল করেছে। দস্যুরা বনের গভীরে বসত করে থাকে। এই দুই দলে মাঝে মাঝে লড়াই দাঙ্গা বাধলেও, অন্যান্য সময় তারা একসঙ্গে খেলাধুলো করে।

গোগ্রাসে যবের নাড়ু গুলো মুখে পুরেই ভীমক কোঁৎ কোঁৎ করে দুধটা গিলে ফেলল। ওর মা বললেন, "আজ এত তাড়া কিসের রে?" ভীমক বলল, "জানো না, দেবদত্ত কতদিন পরে এল। কতদিন দেখিনি।"

মাঃ "দেবদত্ত তো ওর গুরু দেবমিত্র শাকল্যের আশ্রমে গিয়েছিল তাঁর শিষ্য হ'তে, না? প্রায় চার বছর ছিল না? নিশ্চয়ই খুব পণ্ডিত হয়ে ফিরেছে।"

ভীমক বেশ ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিলেঃ "কোন্ দুঃখে যে ও আশ্রমে গেল, কে জানে। ও আমাদের একটা বাঘা লড়িয়ে।"

ওর মা হেসে ফেললেন। বললেন, "যা বেরো, তাড়াতাড়ি ফিরবি।"

মা থালা ধুতে গেলেন।

ছোটবোন দেবীর খুব কৌতূহল হল। বললে, "সোঁটা-বল্লম নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস-রে দাদা?"

ভীমক বলল, "আজ আমাদের একটা বিরাট যুদ্ধ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা জানিস তো? যাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির আর তাঁর ভায়েরা তাঁদের হিংসুটে জ্ঞাতি ভাই কৌরবদের হারিয়ে দিলেন। সেইরকম। আমাদের

হাতীবাহিনীও থাকছে। ধেনুকের গরুর পাল হবে আমাদের হস্তীযুথ। দস্যুছেলেরা কৌরব সাজবে। রথ আর রথী কা ভাবে হাতীর দলের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে বেরোয়—সেটা আমি ওদের দেখাব।"

কৌতূহলে ফেটে পড়ে দেবী, "যুদ্ধটা কোথায় হবে রে দাদা?"

ভীমক বললে—"আমরা যাচ্ছি বারণাবতের ভগ্নস্তূপে। ওখানেই কৌরবেরা পাণ্ডবদের জন্যে নকল প্রাসাদ বানিয়েছিল। তার দেয়ালগুলো বাইরে থেকে রঙীন চটকদার পাথরে ঢাকা ছিল। কিন্তু ভেতরে সব গালা দিয়ে ভর্তি, যাতে আগুন দিলেই দপ্ করে ধরে ওঠে। পাণ্ডবরা অবিশ্যি কোনমতে এই শয়তানীর কথা জানতে পেরে গিয়েছিল, তাই অন্ধকার হতেই তারা প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেদিন রাত্রেই ভীষণ আগুন লেগে সারা বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখন শুধু সেই পোড়া বাড়ির ভাঙাচুরো স্তূপ পড়ে আছে—ঘাস আর আগাছার জঙ্গলে অর্দ্ধেক ঢেকে গেছে। এখন জায়গাটা এমন সমান হয়ে গেছে, যে সহজেই লড়াইয়ের ময়দান করা যায়। আমরা ওখানেই যাব। তার আগে আমার ফাঁপা-গাছের গুঁড়ির অস্ত্রাগার থেকে আমাদের সব অস্ত্রশস্ত্র বার করে নিতে হবে।"

"আমিও যাব, দাদা"—দেবী বায়না ধরল।

"দূর। তুই কোথায় যাবি। এত বড় যুদ্ধে বাচ্চা মেয়েরা যায়না।"

—দেবীর আবদার উড়িয়ে দিয়ে ভীমক ছুট লাগাল।

—দেবী বেচারী খানিক কাঁদল, তারপর চোখ মুছে, তার গাগরী নিয়ে ঝরণায় জল আনতে চলে গেল। নদীর পাড়ে একটা ঢেঙা সাদা বক একপা

তুলে দাঁড়িয়েছিল—দেবী তার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে থেকে, বেলা গড়িয়ে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরেই মার বকুনি খেতে হল—"বাড়ি ফেরার সময় হল? যাও এখন পাশের বাড়ির হারিতির সঙ্গে খেলা কর গে। আমি এক্ষুনি তোমার মাসীকে দেখতে যাচ্ছি, তার অসুখ। বাড়ি ফিরে এসে তোমায় ডাকব।"

দেবী বিনা ওজরে মার কথা মেনে নিল। কিন্তু মনে মনে বলল, "পাশের বাড়ি কে যাচ্ছে! আমি যাব বারণাবতের ভাঙা স্তূপ দেখতে।"

যা ভাবা তাই কাজ। দেবী চলল জঙ্গলের পথে। আর্যদের ছেলে-মেয়েরা বনের জন্তুজানোয়ারকে ভয় পেতনা। এদিকে দেবী তো ভায়ের আগেই পৌঁছে গেছে। তা তো যাবেই। ভীমক তার অশ্বত্থকুঞ্জের অস্ত্রাগার হয়ে, তবে তো রণক্ষেত্রে যাবে।

ওদিকে ভীমক তার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় জমে গেছে। তাঁতীর ছেলে কলাধন, কুমোরপুত্র অলীক, স্বর্ণকার পরিবারের ছেলে জয়ন্ত—সব বন্ধুরা মিলে গল্প-সল্প হ'চ্ছে। কথা আছে, রাখাল ছেলে ধেনুক পরে তাদের সঙ্গে ধ্বংস স্তূপের জায়গায় গিয়ে মিলবে, সঙ্গে যতগুলো পারে গরু নিয়ে যাবে।

ওরা কথা বলছে, দেবদত্ত এল। সকলে শোরগোল করে তাকে অভ্যর্থনা করল। তারপর রাশি রাশি প্রশ্ন আরম্ভ করল।

"বল, কী বিদ্যা শিখলি?" "এখন কি তুই শাস্ত্রের পণ্ডিত হয়ে গেছিস?" "কে কে বন্ধু হল?" পুরনো বন্ধুদের ভুলে যাসনি তো?" প্রশ্নের ফোয়ারা ছুটতে লাগল।

দেবদত্ত খুব মিশুক, বন্ধুদের খুবই ভালবাসে। তবে আগের চেয়ে এখন বেশি চিন্তাশীল হয়েছে, গম্ভীরও হয়েছে। বন্ধুদের জিজ্ঞাসার জবাবে বললে, "এখন আমি চতুর্বেদ পড়ছি। এখনো আট বছর আরো গুরুসঙ্গ করতে হবে, আর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হতে আমার এখন ঢের-ঢের দেরী। বহু কিছু শেখা বাকি।"

অলীক খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললে, "তুই বেশ চালাক চতুর। আমার মাথায় বাপু এত জ্ঞান ঢুকত না।"

ভীমক বললে, "তোমার শক্তিও খুব। তোমার হাতের জোর আমার থেকেও বেশি।" বন্ধুর হাতের পেশীতে চাপ দিয়ে এরপর ভীমক দুঃখ করে

বলল, "শিকার কিংবা রথ চালনায় লেগে থাকলে তোমার জুড়ি থাকত না।"

দেবদত্ত মৃদু হেসে বললে, "আমি কুস্তিটার খুব ভাল অভ্যেস রেখেছি। আর শিকারের কথা যদি বল, তাহলে শোন, আমাদের আশ্রম তো গভীর বনের মধ্যে আর বন্য পশু তো দেদার।"

জয়ন্ত ছেলেটা ইন্দ্রপ্রস্থের জাঁকজমক আর জলুসের গল্প পেলে আর কিছু চায় না। বললে, "জানিসনা দেবদত্ত, কৌরবরা তো মরে গেল। কিন্তু আমাদের মহারাজ শহরটাকে যে কী চমৎকার বানিয়েছেন কী বলব। সারা শহর ঘিরে মজবুত পাঁচিল আর গভীর গড়খাই। উঁচু উঁচু বুরুজ, সেখান থেকে প্রহরীরা চারদিকে নজর রাখে। আমার কাকার বাড়ি পাশের গ্রামেই। তিনি প্রায়ই যান। কাকার গয়নার কারবার কিনা। ভারী ভারী হার, বলয়, কর্ণকুণ্ডল—মেয়ে-পুরুষ সবার জন্যই থাকে তাঁর কাছে। ভাল ভাল দেখবার জিনিস আছে অনেক। রাজপুরী, বিশাল এলাকা নিয়ে বন্য পশুদের জন্যে ঘেরা জায়গা, বিচারশালা তারপর দ্যূত ক্রীড়ার জায়গা (জুয়া-খেলার আড্ডা)।..."

দেবদত্ত আহত সুরে বলল, "দ্যূতক্রীড়া! রক্ষে কর ভাই। জুয়া খেলে যে কতদূর সর্বনাশ হয় সেটা ভোলা উচিত নয়।"

কলাধন বলল, "রাজা-রাজড়াদের যেন হয় যুদ্ধ, নয় মৃগয়া আর নয়তো জুয়াখেলা—এ যেন চাই-ই, নইলে চলেনা। এখন তো যুদ্ধ শেষ। এখন রাজারা এত শিকার করছেন যে, আজকাল বনের ধারের গ্রামগুলোতে জন্তু-জানোয়ারের ভয় অনেক কমে গেছে। এক সময় তো' চিতা আর হায়নার উৎপাতে গাঁয়ে টেঁকা যেতনা। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মুখে করে নিয়ে যায়—এত সাহস বেড়েছিল। এখন কালে-ভদ্রে গরুবাছুর টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু মানুষ আজকাল আর মারা যায় না।"

ওদের ঘড়ি বলতে সূর্য। সেইদিকে তাকিয়ে ভীমক বললে, "আমাদের যুদ্ধে যাবার বেলা হয়ে গেল। ধেনুক নিশ্চয়ই এতক্ষণে গরু নিয়ে জায়গায় হাজির হয়েছে।"

জয়ন্ত বলল, "দেবদত্ত তো এখন ছাত্র, ও সৈনিক হ'তে পারবে না।" ভীমক তার উত্তরে বললে, "পুরোহিতরা রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে যায়। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি ছিলেন। দেবদত্ত, তুই আমার সারথি হবি না?"

দেবদত্ত শান্ত হেসে বলল, "হ্যাঁ, হব।"

অলীক বলল, "ভীমক অনেক সুন্দর সুন্দর বল্লম, রণকুঠার আর ধনুক তৈরী করেছে। তোমার যেটা খুশি বেছে নাও, তুমিই আগে নাও।" একটা বটগাছের ফোঁপরা গুঁড়ির ভেতর থেকে সে সব অস্ত্রশস্ত্র বার করে আনল।

দেবদত্ত দেখে বলল, "বাঃ খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু আমার কুঠার, কি ফিঙে-গুলতি বা ধনুক দরকার নেই। পুরোহিত তো লড়াই করেনা। তাছাড়া আমার যা সড়কি আছে, এই যথেষ্ট।"

ছেলেরা ওর সড়কিটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। সত্যিই খুব মজবুত আর ভারী, আর ডগাটা ছুচঁলো আর শক্ত।

ভাঙা প্রসাদে (জতুগৃহ) পৌঁছে ওরা দেখল, ধেনুক ইতিমধ্যেই তার গরুর পাল নিয়ে হাজির হয়েছে। গরুগুলোর চেহারা মোটেই নিরীহ নয়, বেশ ভয় পাবার মতন। হবেই তো। সেই প্রাচীন ভারতের জঙ্গলে ধরা আধা জংলা আদি গরুর পাল তো। বিশাল দেখতে। এক একটা গরুর পিঠে এক একজন মাহুত—মানে, একজন করে বেঁটে কাল দস্যু ছেলে। ধেনুক ওদের ডেকে এনেছে আজকের খেলনা লড়াইয়ে যোগ দিতে।

ভীমকের দলের ওপর নজর পড়তেই ওরা হৈ হৈ রৈ রৈ করে ভয়ানক চীৎকার করে উঠে, ওদের 'হাতীকে' ডাঙশ মারল, এবং এগোতে হুকুম করল।

'পাণ্ডবপক্ষ' আক্রমণ করল। কারণ তাদের পক্ষেই রথী-মহারথীদের থাকবার কথা। তারা যে যার বল্লম মাথার ওপর তুলে ধরে প্রবল চীৎকার করে ছুটে গেল। গরুর পাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রথীরা যখন খুব কাছাকাছি এসে পড়ল, তখন মাঝখান থেকে ফাঁক হয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে 'পাণ্ডবরা' ছুটে পার হয়ে গেল। গরুর পাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে 'রথীরদল' 'হস্তীবাহিনী'কে হারিয়ে ফেলল। আর হস্তীবাহিনীর কথা আর কী বলব! তারা পুরোপুরি হতভম্ব আর বিশৃঙ্খল হয়ে গেল।

হঠাৎ সেই বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত গরুর পালের খুরের খুটখুট ধ্বনির মধ্যে থেকে একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ কানে এল। কী ব্যাপার! এই গোলমালের মধ্যে একটা চিতাবাঘ ঘাপটি মেরে বসে ছিল, সুযোগ বুঝে একটা গরুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গরুটা পাল থেকে খানিকটা দূরে ছিটকে পড়েছিল। কিন্তু হাজার হ'ক ছেলের দল হচ্ছে বনের বাসিন্দা, জংলী জানোয়ারের সদাই উৎপাতের সঙ্গে তারা পরিচিত। তাদের মুখ থেকে গরু-মোষ আগলে রাখতেও তারা অভ্যস্ত। তারা অট্ট চিৎকার করে লাফ দিয়ে পড়ল। ধেনুক চিতাটাকে খুব পিটোতে লাগল। এদিকে যে রাজা ষাঁড়টা পালের গোদা, সে চিতার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ার জন্যে খুর ঘষে পেছন দিকে ছুটে গেল। ছেলেরা আর গরুর দল তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তার পথ করে দিল। ধেনুক একলাফে ষাঁড়ের রাস্তা খালি করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে চিতাটা ভয় পেয়ে পাশের দিকে লাফিয়ে পড়ে ঝোপের আড়ালে পালিয়ে গেল।

ছেলের দলের মাঝে জয়ধ্বনি উঠল। কিন্তু হঠাৎ একটা সরু গলার চাপা আর্তনাদ কানে এল, একটা বাচ্চা মেয়ের চীৎকার। শুনেই ছেলেদের রক্ত হিম, ভীমক তো অসাড় হয়ে গেছে. তার বোনের গলার আওয়াজ।

হয়েছে কী। দেবী একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। যেই বেরিয়ে আসতে যাবে, চিতাটা তাকে দেখে ফেলেছে। আর যায় কোথায়। ওর দিকে তাক করে এগোচ্ছে, আর একটু হলেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। ভীমক আর ধেনুক আগে, তাদের পেছনে সব ছেলের দল, সবাই একসঙ্গে পড়ি মরি করে চিতাটার মুখ থেকে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে ছুটল। কিন্তু মহা মুশকিল দেখা দিল। কী করে বাঁচানো যায়। চিতাটাকে যদি পেছন থেকে মারা হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে দেবীকে চোয়ালে পুরবে।

ওরা কী করবে! ভাববার সময় কই। হঠাৎ, দেবদত্ত তার সড়কি উঁচিয়ে সকলকে ছাড়িয়ে দৌড়ল। চিতার চোয়াল দেবীর কাঁধের ওপর বসে যাবার আগেই দেবদত্ত তার সড়কি চিতার গলার ভেতর সজোরে চালিয়ে দিল।
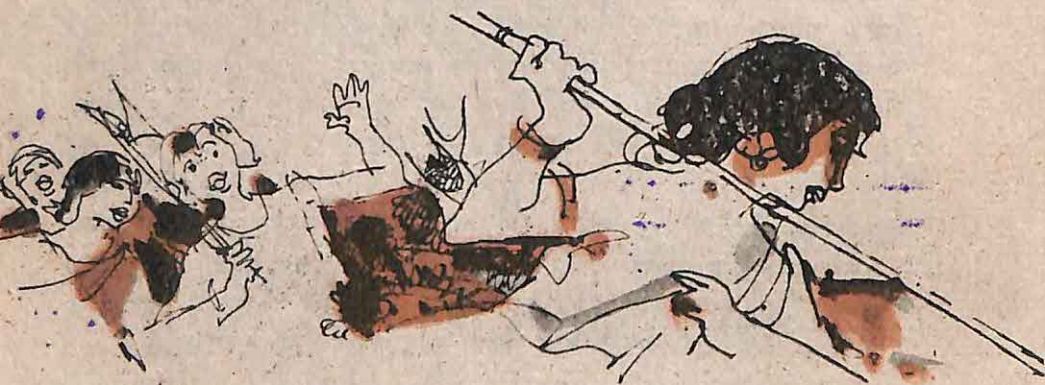
লাল রক্তের ধারা দেবীর কাঁধ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল; চিতাবাঘটার লেজ গুটিয়ে গেল। সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে এল, তারপর প্রাণহীন শরীরটা মাটিতে এলিয়ে পড়ল। দেবী তখনো ফোঁপাচ্ছে,—তবে ব্যথায় নয়, ভয়ে।

ভীমক উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তোর কোথাও চোট লেগেছে?" কোথায় লেগেছে?"

"আমি জানিনা"—দেবী ভয়ে ভয়ে জবাব দিল। তারপরেই কান্নায় ভেঙে পড়ল।

দেবদত্ত অবস্থাটার হাল ধরল। বলল, "শোন্, তোর কোথাও লাগেনি। তোর গায়ে যে চাপ চাপ রক্ত দেখছিস ওটা চিতাবাঘটার রক্ত। তুই তো চিতাটাকে মেরে দিয়েছিস—বোকা। হ্যাঁ, দেখ কেমন মুখ সিঁটকে মরে পড়ে আছে। ভয় কি। এই নে সড়কি নে, ঘোরা, চিতার মুখের ওপর খুব জোরসে ঘোরা দেখি,...হ্যাঁ—এই তো। দেবীর হাতে দেবদত্ত একটা লকড়ি গুঁজে দেয়।

দেবীর চোখের জল ততক্ষণে শুকিয়ে গেছে। সে হেসে ফেলল। ভয়ে ভয়ে একবার লাঠিটা ও ঘোরাল। তারপর খুবই সন্দেহের সঙ্গে প্রশ্ন করল। "রক্তটা কার, আমার না বাঘের?"

দেবদত্ত বললে, "চল ঐ ডোবায় গিয়ে ধুয়ে ফেলবি, চল্। তাহলেই বোঝা যাবে।"

ওরা পুকুরে গেল। দেবী তার গা থেকে সব রক্ত ধুয়ে ফেলল। ভীমক যখন নিশ্চিন্ত হল যে, বোনের কোথাও চোট লাগেনি, তখন তার রাগ দেখে কে। কসে বকুনি লাগাল, আর বেচারা আবার কাঁদতে শুরু করল।

দেবদত্তর মায়া হল। বললে, "থাক্ আর বকে কাজ নেই। চিতাবাঘের খপ্পরে পড়েই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে ওর। আর কখনো কাউকে না বলে একলা বেরোবি না তো, কীরে দেবী?"

দেবী জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে। তারপর দেবদত্তর হাতটা আঁকড়ে ধরে মরা চিতাটার কাছে এগোয়।

ইতিমধ্যে দস্যু ছেলেরা, তাদের কাছেই বাড়ি; ছুটে, ছুরি চাকু আনতে গেছে, বাঘের চামড়া ছাড়াবে বলে। এই কাজে ওরা বিশেষ পটু।

অন্য ছেলেরা মরা বাঘটাকে ঘিরে ধরে দেবদত্তর দিকে খুব তারিফের নজরে তাকাল। বলল, "ওঃ, মার যা একখানা দিয়েছ ভায়া, জবাব নেই। তা তোমাদের আশ্রমে বুঝি এই সব শেখায়। তাহলে চলনা আমরা সব্বাই গিয়ে ওখানেই পড়াশুনো করি!"

দেবদত্ত তার স্বভাবমাফিক শান্ত হাসি হাসল। সে বললে, "আমার গুরু একদিন ঠিক এই কায়দায় একটা ভালুককে মেরে তার মুখ থেকে আমার এক গুরু-ভাইকে বাঁচিয়েছিলেন, দেখেছি।"

ধেনুক বললে, "দাঁড়া, আমরা চিতাবাঘের ছালটা ছাড়াই তারপর তুই ওটা নিয়ে পরবি—বিজয়ীর চিহ্ন।"

দেবদত্ত হাসল, "হয়েছে। তুই নে আগে তোর গরুগুলো সামলা।" এদিকে মরা চিতাবাঘটা দেখেও দেবীর ভয় যায়নি। সে ফের কাঁপতে শুরু করেছে। দেবদত্ত দেবীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "চল্ আমরা

সেই গরুটার কাছে যাই, ওটাকে একটু আদর করি। চিতাবাঘের দাঁত আর থাবা লেগে ও তোর চেয়ে ঢের বেশি ঘায়েল হয়েছে।"

ভয়ে আর যন্ত্রণায় গরুটা আধমরার মতন হয়ে রয়েছে। দেবদত্ত ওর গায়ে চাপড়ে চাপড়ে আদর করল। জলের ধারে নিয়ে গিয়ে পরম মমতায় ঘাগুলো ধুয়ে দিল। চামড়ার ওপর জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে, রক্ত ঝরছে। তবে চোট কোথাও গভীর নয়।

দেবদত্ত দেবীকে বললে, "চল্ গরুটার পিঠে বিশল্যকরণী লাগিয়ে দিই, ওর ব্যথা মরে যাবে।"

দেবী একটা ঝোপের ধারে গিয়ে সেই গাছের পাতা ছিঁড়ে একমুঠো ঘাস নিয়ে গরুটার ঘাড়ে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর ওরা দুজন গরুটাকে একটা তাজা সবুজ ঘাসে ভরা ময়দানের দিকে নিয়ে গেল। গরুটা আরাম করে ঘাস চিবোতে লাগল।

ধেনুক প্রশংসা করে বললে, "দেবদত্ত, তুমি যেমন পাকা শিকারী, তেমনি ভাল গয়লা। গরুর পরিচর্য্যা কোথায় শিখলে?"

দেবদত্ত বলল, "বাঃ আমাদের আশ্রমে তো অনেক গরু। আমাদেরই দেখাশুনো করতে হয়। সামলে নিয়ে চরাতে যেতে হয়। গোচারণ মাঠ আশ্রম থেকে অনেক দূরে। আর আমাদের ওদিকের জঙ্গল—এখানকার চেয়ে অনেক বেশি ঘন আর গভীর।"

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল, "আশ্রমে কী খাস?" জয়ন্ত বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট। নিজের এবং অপরের খাবার ব্যাপারে তার একটু আগ্রহ বেশি।

"খাই, সকলে যা খায় তাই" দেবদত্ত জবাব দিলে, "চাল, গম, যব, দুধ আর মাংস। তবে অন্য জিনিসের তুলনায় মাংসটা একটু কমই খাওয়া হয়।"

অলীক বললে, "দুধ খেয়েই বোধহয় তোর গায়ে এত জোর।"

দেবদত্ত বললে, "তা নয়। দুধ-ঘি-মাখন-দই আমাদের অঢেল আছে বটে, কিন্তু আসলে আমাদের কঠোর জীবনচর্য্যাই এত শক্তি দেয়।"

দেবীর শরীরটা খারাপ লাগছিল, ও কাঁপছিল। দেবদত্ত বলে, "চল মেয়েটিকে ওর মা'র কাছে পৌঁছে দিই।"

অলীক বললে, "চিতাবাঘ গরুটাকে ঘায়েল করেছিল, তা গরুটা ভুলে গেছে। কিন্তু দেবী এখনো চিতাবাঘের চোয়াল ভুলতে পারছে না।"

দেবদত্ত বলল, "তা তো হবেই, মানুষের স্মৃতিশক্তি পশুদের চেয়ে

দীর্ঘস্থায়ী।"

জয়ন্ত কলাপাতায় মুড়ে প্রচুর নাড়ু এনেছিল। ধেনুক দস্যু ছেলেদের সেই নাড়ু দিল। তারা ধেনুককে কথা দিল যে, মরা বাঘটা হায়েনা-শেয়ালের পেটে যাবার আগেই ওরা তার ছালটা ছাড়িয়ে রাখবে। তখন আর সবাই বাড়ি গেল। একে হাঁটাহাঁটি, তার ওপর এত সব ধকল! দেবী এবার ঘুমে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। ভীমক, অলীক আর দেবদত্ত পালা করে ওকে কোলে নিয়ে হাঁটতে লাগল। ভাগ্যি ভাল ওরা যখন বাড়ি গেল, মা তখনো ফেরেনি।

দেবী বাড়ি ফিরে মাদুরে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। ভীমকের মা ফিরলেন। ছেলের বন্ধুদের দেখে আনন্দ করলেন। দেবদত্তের আশ্রম জীবনের কথা জানতে চাইলেন। এক সময় ফাঁক বুঝে দেবদত্ত দেবীর চিতাবাঘ ঘটিত ইতিহাস তার মাকে বলল। বলল, "দেবী আর কোনদিন একা বেরোবে না।"

দেবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে খুব মন দিয়ে সব শুনছিল। বড় বড় চোখ মেলে সভয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মা যখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। তখন দেবী আশ্বস্ত হ'ল যে মা আর বকবে না।

এবার দেবীর আর কোন ভয় নেই। চিতার ভয় তো আগেই ঘুচেছে, এবার শাস্তির ভয়টাও আর রইল না। এখন সে বেশ মন খুলে গল্পে যোগ দিল। ঘুম ঘুম চোখে সে বলল, "কাল ধেনুক বাঘের ছালটা আনবে। ধেনুক আর দস্যু ছেলেরা ছালটা ছাড়াচ্ছে।"

দেবদত্ত ভীমকের মাকে বলল, "আপনি চিতাবাঘের ছালটা রাখুন না। শীতের রাত্তিরে বেশ গরম লাগবে।"

মা বললেন, "না রে বাবা, ও আমার দরকার নেই। দুঃস্বপ্ন দেখব শেষকালে।...তুই এখন ক'দিন থাকবি তো ?"

"হ্যাঁ থাকব। আমার গুরুদেব দেবমিত্র শাকল্য যতদিন না আশ্রমে ফেরেন, ততদিন থাকব। ওঁর ইন্দ্রপ্রস্থে ডাক পড়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন তো।"

"জানেন ত", পৃথিবী সুদ্ধ সমস্ত রাজারা যাঁকে বড় বলে মেনে নেন, একমাত্র এমন রাজাই এই যজ্ঞ করতে পারেন। যদি কেউ এই মহারাজকে যুদ্ধে আহ্বান জানাতে চান, তাঁকে এই যজ্ঞের ঘোড়া ধরতে হবে। ঘোড়াটা সারা বছর ধরে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। বছর ত' শেষ হতে চলল। ইতিমধ্যে সব রাজ্যের রাজারাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের রাজাধিরাজ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই ইন্দ্রপ্রস্থে অশ্বমেধ যজ্ঞ হতে চলেছে। প্রধান প্রধান আশ্রমের সব গুরুরা রাজধানীতে নিমন্ত্রিত হয়েছেন ; তাছাড়া গঙ্গা, যমুনা, শোন, গণ্ডক...এইসব নদীর ধারে তপোবনে থাকেন যে সব পুণ্যবান মহা ঋষিরা—তাঁরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছেন যজ্ঞে।"

দেবী ঘুম ঘুম চোখে কথার মধ্যেই বলে উঠল, "আমার ঘুম পেয়েছে, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়ব। একটা কথা বলে নিই। জানো মা, দেবদত্ত আমাকে আর গরুটাকে দুজনকেই বাঁচিয়েছে। ও খুব ভাল......"

ভীমক হেসে উঠল। বলল, "আমরা শুনেছিলাম, দেবদত্ত আশ্রমে গেছে বেদ অধ্যয়ন করে পণ্ডিত হবে বলে। কিন্তু ও যে ভাল শিকারী আর গয়লার কাজও শিখতে গেছে তাতো জানতুম না। আবার এখন দেখছি, বাচ্চাদের সামলাতেও শিখেছে বেশ......"

"আসলে আশ্রমে গিয়ে ও যা শিক্ষা পাচ্ছে, সেটাই হল আসল বিদ্যা ; তার নাম—জ্ঞান।"—ভীমকের মা মৃদু শান্ত স্বরে বললেন।

পাটলিপুত্রের পথে ঃ পান্থশালায়

পাটলিপুত্রের পথের ওপর পান্থশালাটিতে আজ বেশ সরগরম। এই মাত্র পূবের দেশ থেকে একটা বিশাল উটের মিছিল এসে পৌঁছেছে। মৌর্য বংশের তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করিয়েছেন, এটিও তারই একটি।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে, সম্রাট অশোক তার বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। সারা দেশময় সরণিজাল বিস্তৃত ; এক-প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যুক্ত। জনকল্যাণের তত্ত্বাবধানের জন্যে সম্রাট নিজে ও তাঁর আমাত্যরা সারা দেশে যখন তখন ঘুরে বেড়ান। বণিক আর পর্যটকেরা এখন নিশ্চিন্দে এবং অনায়াসে দূরদূরান্তে ঘুরতে পারেন। বহু জায়গায় বন কেটে নতুন বসত হয়েছে। সেসব জায়গায় সামাজিক রীতি-রেওয়াজ আচার বিচারে শহর বা পল্লীগ্রামের মতন অতটা কড়াকড়ি নেই।

পান্থশালার তত্ত্বাবধায়কের সংসারে নানান দেশের লোক। ভদ্রলোক নিজে মাঝবয়সী, লম্বা ঋজু কাঠামো—সৈনিকের মত চেহারা, দেখলে মনে হয় উত্তরাখণ্ডের লোক। তাঁর মা, বুড়ি হয়ে গেছেন, চামড়া কুঁচকে গেছে কিন্তু এখনও টকটকে রঙ, চেহারায় জেল্লা। কিন্তু তাঁর বউ ছোটখাট গড়ণের, গায়ের রঙ কালো। সবচেয়ে গরমিল ছেলে-মেয়েদের চেহারায়, কারুর সঙ্গে কারুর সাদৃশ্য নেই। একেবারে কোলের দুটোর—একটা ছেলে আর একটা নেহাৎই বাচ্ছা—তবু যাহোক একটু

মিল আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় মেয়েটির রঙ তার মার মত কাল, মাথার চুল কাল, কোঁকড়া, ঠোঁট পুরু।

সবে দুপুরবেলা। পান্থশালা গমগম করছে। আশ-পাশের বনে জঙ্গলে মেলাই হিংস্র জন্তুর উৎপাত। তাই মুসাফিররা অন্ধকার হবার অনেক আগেই সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে। তাম্রলিপ্ত থেকে এক বণিক এসেছেন। তাঁর সঙ্গে গরুর গাড়িতে জালায় ভর্তি মশলা ও গন্ধদ্রব্য, গাঁঠ গাঁঠ কাপড়—রাজধানীর বাজারে বিক্রি হবে। রাজার একজন আমাত্যও পান্থশালায় উঠেছেন; তাঁর সঙ্গে রয়েছেন একজন পরিদর্শক নথি রক্ষক বা সেরেস্তাদার ও তাদের কয়েকজন অনুচর। পর্যটক আছেন আরো দু'জন। এক পরিব্রাজক তাঁর পড়নে সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। কাঁধে ঝুলছে চিতাবাঘের ছাল। দেশের সমস্ত মঠ ও বিহারগুলি পর্যটন করতে বেরিয়েছেন। গৌড়ের (বাংলা) এক ছাত্র আছেন—সুদূর তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্য বেরিয়েছেন।

কূপের জলে স্নান সমাপন করে সুভোজ্য আহারান্তে অতিথিরা প্রাঙ্গণে বসে কথাবার্তা বলছেন। তত্ত্বাবধায়ক আর তাঁর মা এসে তাঁদের মধ্যে বসে তাঁদের কথাবার্তা সাগ্রহে শুনতে লাগলেন। সওদাগরেরা পাটলিপুত্রের বাজারের পণ্য প্রদর্শনীর কথা বলছিল। এই সময় তত্ত্বা-বধায়কের স্ত্রী ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে ডেকে বললেন, "এসো না, মার কাছে এসে একটু বোস। সওদাগর ভদ্রলোক কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলছেন, শোননা। পশুচর্ম, গালচে, কম্বল, ভাল রেশম, রঙীন সুতীর কাপড় বাসন-কোসন, উত্তরদেশ থেকে আনা বর্ম...কত কিছুর গল্প শুনছি আমরা...তাঁর কথার মধ্যেই বণিক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "তাছাড়া আছে হাতীর দাঁতের কাজ, সোনার হার, রান্নার মশলা, প্রসাধনের জন্যে নানান গন্ধদ্রব্য অঙ্গরাগ।"

মহিলা তাঁর স্বামীকে বললেন, "তোমরা বোস, আমি এক্ষুনি আসছি। আর একজন অতিথি এইমাত্র এলেন, উত্তরের একজন পাথর-খোদাই-কার। অনেক দূর থেকে এসেছেন, খিদেও পেয়েছে খুব।"

উঠোনের এককোণে এক বৃদ্ধ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, "সম্রাট নিজে একজন পাকা যোদ্ধা, ছেলেরাও যোদ্ধা, অথচ শুনতে পাচ্ছি যে সম্রাট নাকি যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা কী? দেশে শান্তিরক্ষা হবে কী করে?"

"শান্তিরক্ষা বেশ সুচারুভাবেই হচ্ছে তো।"—বণিকটি বেশ জোর দিয়ে বললেন, "আমরা বিদেশী শত্রুর হাত থেকে নিশ্চিন্ত, কেউ আমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করেনা; আগে আগে দেশের কোন অঞ্চল দিয়ে সৈন্য হেঁটে গেলে, তাদের খাওয়াতে হত আমাদের, এখন সে-দায় নেই; পথেঘাটে চোরডাকাতের ভয় নেই, সম্রাটের লোকজনেরা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করছেন; তার ওপর রাজ-আমাত্যরা আগের মতন বেপরোয়া বা অত্যাচারী হয় না, তাঁরা নিজেরা বিধি-নীতি মানেন, এবং অন্যদের মানতে বাধ্য করেন।"

সেরেস্তাদার মৃদু হেসে বললেন, "আজকাল নথিপত্র এত ভালভাবে রাখা

হয়, এমন যত্নের সঙ্গে তার দেখাশুনা করা হয় যে কোনরকম গোলমালের সম্ভাবনাই নেই। সম্রাট তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ নিয়েছেন প্রেম ও অনুশাসনের বিধি দিয়ে শাসন করতে, ভয় দেখিয়ে নয়।"

বুড়ো লোকটি তবু গজগজ করতে থাকেন, "তাতো হ'ল, কিন্তু শত্রুরা দেশের ভেতর থেকেই হ'ক, কিংবা বাইরে থেকেই হ'ক—যদি হামলা করে, তখন কী করে ঠেকাবে? তার বাপ-পিতামহ যে রাজত্ব কায়েম করে গেছেন, সেটা যদি নষ্ট হয়!"

"এবার সন্ন্যাসী কথা বললেন, "রাজা রাজ্য শাসন করেন ধর্মের সাহায্যে, তাকেই বলে বিধি—ভীতি বা সন্ত্রাস দিয়ে শাসন করা যায় না।" সেরেস্তাদার বললেন, সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করা হয়নি। সীমান্তগুলি সুরক্ষিত আর শাসনবিধিগুলি যথাযথ পালিত।"

সন্ন্যাসী আরও বললেন, "আমাদের সাধু সম্রাট ঘোষণা করেছেন, 'রণদামামার ভূমিকা নেবে ধর্মবিধির অনুশাসন' এবং 'হৃদয় জয়ই প্রকৃত জয় ও একমাত্র জয়।'

বণিক বললেন, "সেই কারণেই সম্রাট শিলায়-শিলায় ও স্তম্ভগাত্রে ধর্মবিধিগুলি অংকিত করিয়ে দিয়েছেন, যাতে সমস্ত লোক তাদের কর্তব্য

বিষয়ে সচেতন হতে পারে এবং আইনশৃঙ্খলা যাতে সুরক্ষিত হয়। দেশের সর্বত্র এখন সম্রাটের বাণীগুলি ক্ষোদিত অবস্থায় দেখা যায়।"

সন্ন্যাসী বললেন, "এইসব শিলালিপিতে সম্রাট, শাসনকর্তা ও সমস্ত অধস্তন কর্মচারী আর দেশের সমস্ত লোকের প্রতি ধর্ম ও কর্ম বিষয়ে সব বিধির নির্দেশ দিয়েছেন।"

সওদাগর এবার একটা তর্ক তুললেন, "সম্রাট তো পীতকামায়ধারী শ্রমণ-ভিক্ষুকদের অনুগামী। তা আপনি তো ঐ মতের সন্ন্যাসী নন। আপনি কেন তাঁর এত প্রশংসা করছেন?"

সেরেস্তাদার বললেন, "সম্রাট সব ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করেন, সব ধর্মের মানুষকে আদর করেন। গৌড়ের বিখ্যাত জ্ঞানীভিক্ষু উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি করুণাময় তথাগত বুদ্ধদেবের ধর্ম অবলম্বন করেছেন বটে, কিন্তু সম্রাট মনে করেন যে সব ধর্মেই কল্যাণের কথা আছে। তিনি চান ধর্ম মানুষে মানুষে মিলন ঘটাবে, বিভেদ বাড়াবে না।"

সন্ন্যাসী বললেন, "একটি শিলালিপিতে সম্রাটের সাবধান বাণী বলা হয়েছে—'কেউ তার নিজের ধর্মবিশ্বাসের সুখ্যাতি করতে গিয়ে অন্যের বিশ্বাসকে নিন্দে করবে না। তাঁর প্রচারের বিষয় হল নম্র ভাষণ আর শুভ কাজ।"

পান্থশালার রক্ষক বললেন, "সম্রাট যে-শাসন প্রচার করেন, নিজের জীবনেও তা পালন করেন। তাঁর শুভকর্ম ও শুভবাণীর জন্যেই সকলে তাঁকে মানে, তাঁকে ভালবাসে। তাঁর সেই নম্র বাণীগুলিই পাথরে আঁকা আছে। তাঁর কল্যাণ কর্মগুলি সব সময় আমাদের ঘিরে রয়েছে। দেখুন না বণিক আর পথচারীদের জন্যে রয়েছে পথের সুব্যবস্থা, চাষীর জন্যে রয়েছে জলসেচের বন্দোবস্ত, মানুষ আর পশুর রোগের চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল। আট ক্রোশ অন্তর রাস্তার ধারে সরাইখানা। তাতে ইঁদারা আর মালপত্র রাখার গুদাম ঘর। পথের পাশে পাশে বট অশ্বত্থ আর তেঁতুলের গাছ এমন ভাবে লাগানো, যাতে লোকে ছায়ায় ছায়ায় হাঁটতে পারে। শহর আর গ্রামের সীমা ছাড়ালেই আমের বাগান। সেখানে কেবল মানুষ কেন, পশুপাখিও নিরিবিলিতে বিশ্রাম করতে পায়, জলযোগ করতে পায়, আরাম পায়।"

কথাবার্তা চলছে এই সময় সরাই-রক্ষকের বউ দিনের শেষ অতিথিকে নিয়ে আসরে এলেন। লম্বা চওড়া চেটালো মুখ লোকটিকে দেখে বেশ মিশুক আর খোশমেজাজী বলে মনে হয়। শাশুড়ির পাশে বসে রক্ষকের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বললেন, "বিম্বি গরুর জাবনা দিয়েই আসছে।"

নবাগত অতিথি বললেন, "আমি আমার গরুঘোড়ার দেখাশুনো সাধারণত নিজেই করি। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি যে রকম নিপুণভাবে খাওয়ানো জল দেখানো করল, তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে আসতে পারলাম।"

রক্ষক বললেন, "আমার মেয়ে জীবজন্তু ভালবাসে।" এবার সওদাগরের অবাক হবার পালা। বললেন—"ঐ কালোচুল মেয়েটি আপনার মেয়ে!"

"হাঁ, আমার মেয়েই তো।" রক্ষক গলায় জোর দিয়ে বললেন।

এবার অতিথিরা সবাই আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাঁরা সকলেই ঐ কালো মেয়েটিকে বনবাসীদের মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিলেন।

গতিক দেখে শেষ অতিথিমশায় কৌশলে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন—"আমি আমার বাড়ির লোকদের অনেকদিন দেখিনি। এবার যখন আবার উত্তর দেশে ফিরব, আমার ছোট্ট মেয়ে-আপনার মেয়েরই সমবয়সী হবে— আমাকে চিনতেই পারবেনা।"

রক্ষকের স্ত্রী এতক্ষণ পুরুষদের কথার মধ্যে কোন কথা বলেননি। এবার খুব মৃদুকণ্ঠে বললেন, "ভদ্র, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী। যদিও আপনি এদেশের ভাষা ভালই বলেন। আপনার বাড়ির লোকেরা কোথায় থাকে?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমি ইরাণের লোক। তক্ষশিলায় পাথর-কাটার কাজ করি। আপনাদের মহান রাজা অনেক বছর আগে একবার তক্ষশিলায় যান। সেই সময় ইরাণী প্রস্তর শিল্পীদের বসতির কথা তাঁর কানে যায়। পরে তিনি পাথর ক্ষোদাই কাজের জন্য আমাদের কয়েকজনকে আনিয়ে নেন।

সওদাগর বললেন, "আমরা আমাদের সম্রাটের শিলালিপির কথা বলাবলি করছিলাম। তিনি তো প্রজাদের উদ্দেশে ঐভাবেই বাণী দেন। ভালই হ'ল আপনি আমাদের বলতে পারবেন ঐ সব ধর্ম্মশিলার পাথরগুলি কীভাবে কাটা এবং ক্ষোদাই করা হয়। এইভাবে প্রস্তরলিপির অনুশাসন; তাঁর আগে আর কোনো রাজাই চালু করেন নি।"

ইরাণী লোকটি বললেন, "আমার দেশে অবিশ্যি শিলালিপি ব্যাপারটা নতুন নয়। আমাদের মহান রাজা দারিয়ুস্ একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে বাণী ক্ষোদাই করিয়েছিলেন।"

"তাঁর শিলালিপিতে কী লেখা আছে?" সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন।

ক্ষোদাই শিল্পী বললেন, "ঐ সব লিখনে তাঁর মহিমা ও জয়গান লেখা আছে।"

সন্ন্যাসী বললেন, "আমাদের সম্রাটের বাণী তাঁর নিজের মহিমার জয়গান নিয়ে নয়, তাঁর বাণীগুলি প্রজাদের কল্যাণের কথা। তিনি চান সকলে সুখী হোক। তিনি বলেন, ধর্মপালন থেকেই সুখ পাওয়া যায়। আর ধর্মপালন মানে নম্রতা, মহানুভবতা, সত্যনিষ্ঠা, বয়স্কদের প্রতি সম্মান, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুদের প্রতি, দীনদুঃখীদের প্রতি যথাযথ ব্যবহার—এইসব আচরণ।"

সেরেস্তাদার জানালেন, "ভাল ধাত্রী যেমন তার হেফাজতের বাচ্চাকে ডানা ঢাকা দিয়ে রাখে, সম্রাট চান রাজপুরুষেরা তেমনি প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধির চিন্তায় ব্যস্ত থাকুন। বনে জঙ্গলে যে সব জংলী জাতের মানুষ সভ্যতার সীমান্তে বাস করে, সবাই যাদের নানাভাবে জ্বালাতন করে, ঘেন্না করে —সম্রাট অশোকের মমতার হাত তাদের জন্যেও বাড়ানো আছে।"

শেষ কথাগুলো শুনতে শুনতে কমবয়সী মহিলার চোখ দুটো জলে ভরে

এল। তাঁর শাশুড়ী নিবিড় মমতায় তাঁর হাত ছুখানি জড়িয়ে ধরলেন। বৃদ্ধা এবার কথা বললেন, "কিন্তু বাবারা, সবাই তো আর লেখা পড়া জানেনা। এসব ভাল ভাল কথা তারা কি করে বুঝবে? জংলী মানুষগুলো তো মোটেই বুঝবেনা।"

সওদাগর বললেন, "না মা, লিপিগুলো কিন্তু মোটেই বিদ্বান পণ্ডিতদের ভাষায় লেখা নয়। সব সাধারণ লোকের মুখের ভাষায় লেখা।"

সেরেস্তাদার বললেন, "রাজার লোকজনেরা স্থানীয় সব লোককে ডেকে বাণীগুলো পড়ে শুনিয়ে যান। কিন্তু আসুন এখন আমাদের বন্ধুর কাছে শোনা যাক—শিলাস্তম্ভগুলো কীভাবে কাটাই ক্ষোদাই হয়।"

প্রস্তরশিল্পী শুরু করলেন, "পাথর আসে ছুটো জায়গা থেকে। ছিটছিট লাল আর সাদা বেলেপাথর আসে মথুরার কাছ থেকে, আর পাটকিলে রঙের বেলেপাথর আসে বারাণসীর কাছে চুণার থেকে। একটা অখণ্ডিত বিশাল পাথর কেটে স্তম্ভের দণ্ড তৈরী হয়। তারপর ঐ দণ্ডকে ঠিক গড়ন দেওয়া, ক্ষোদাই করা তাকে মসৃণ করে তোলার জন্যে ভারত ও ইরাণের শিলাশিল্পীর এক বিরাট দল পরিশ্রম করেন। এর পরে, পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের বহু থামওয়ালা অলিন্দে

যেমন স্তম্ভগুলিকে ফুল লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়, তার বদলে আমরা আমাদের স্থাপত্য শিল্পের সবরকম নৈপুণ্য দিয়ে স্তম্ভের শীর্ষদেশটা মণ্ডিত করি, আর স্তম্ভের গা ঝকঝকে করে মেজে-ঘষে ধাতুর জিনিসের মতন চকচকে উজ্জ্বল করে তুলি।”

সওদাগর জিজ্ঞেস করলেন, “আমাদের ভারতীয় কারুশিল্পীরা ঐ ধরণের মাজার কাজটা জানেনা?”

“পাথর মাজার ঐ বিশেষ ধরণের দক্ষতাটা ইরাণীদের বেশ আয়ত্তে আছে, আর স্তম্ভের মাথায় জীবজন্তুর ক্ষোদাই করাতেও তাঁরা সিদ্ধহস্ত। আবার ভারতের পাথরের কারিগরেরা সুদূর গিরনরে সুদর্শন হ্রদের ওপর বিরাট বাঁধ বানানোর মত প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজে বিশেষ পটু।” সেরেস্তাদার বুঝিয়ে বলেন।

শিল্পী বলতে থাকেন—“মাথার জন্যেও একটা আস্ত পাথর লাগে। এক্ষেত্রে ভারতের কারিগরেরা একটা নতুন রীতির আমদানী করেছেন। তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি খুব বেশি। স্তম্ভশীর্ষের তলাটা সচরাচর একটা প্রকাণ্ড কড়াইয়ের আকারের। আবার পত্রপল্লবে সাজানোর পর অনেকটা পদ্মফুলের মতন সুন্দর রূপ নেয়। সবশেষে স্তম্ভশীর্ষে কোনও বৃহৎ পশুমূর্তি ক্ষোদাইয়ের কাজ। এই ব্যাপারে আমরা আমাদের সমস্ত কারিগরী বিদ্যে উজাড় করে ঢেলে দিই।”

“পশুমূর্তি মানে?” শিল্পীর পাশেই এসে কখন বসেছিল ছোট মেয়েটি। প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে সে জানতে চাইল—“কী পশু?” মৃদু হেসে শিল্পী বললেন—“সিংহ, সিংহ, আবার কী! অবিশ্যি ছোট আকারে। সিংহ

হ'ল পশুরাজ—তোমাদের দেশেও, আমাদের দেশেও। ষাঁড় বা ঘোড়ার মূর্তিও থামের মাথায় আঁকলে খুব মানায়। সারনাথের সেই বিখ্যাত, সবচেয়ে সুন্দর স্তম্ভটির গায়ে চারটি বিরাট পশুরাজ পিঠোপিঠি করে বসে আছে—পৃথিবীর চারটি ধামের দিকে চোখ রেখে।"

ভাস্কর বলে চলেন, "স্তম্ভের দণ্ড আর শীর্ষ দুই-ই যখন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, তখন বাকি রইল নির্দিষ্ট জায়গার মাটিতে স্তম্ভটিকে শক্ত করে পোঁতা, আর তার মাথাটি লাগানো।"

"চুড়োটি কীভাবে লাগানো হয়?"—তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্ন করলেন।

"চুড়োটা দণ্ডের মাথায় বসিয়ে একটা খুব বড় তামার খিল দিয়ে আটকে দেওয়া হয়"—ইরাণী ভাস্কর জানালেন।

"ভারতীয় শিল্পীরা যে পশুমূর্তি ক্ষোদাই করতে ভালবাসেন সেটি হাতী।" সন্ন্যাসী বললেন। "শিলা ধৌলির এক গাত্রে এমন একটি হাতী ক্ষোদাই করা দেখেছি, মনে হয় যেন জীবন্ত, এইমাত্র জঙ্গল থেকে বেরোল। তার পাশেই আর একটি শিলায় সম্রাটের শাসনলিপি—হাতিটি যেন সেই দিকে ইংগিত করছে।"

ছাত্রটি জানতে চাইল—"রাজার বাণী কীভাবে আপনাদের কাছে আসে? কিভাবেই বা সে বাণী স্তম্ভের গায়ে ক্ষোদাই করেন?"

"মিহি-সূতীর কাপড়ের ওপর লেখা, সম্রাটের বাণীগুলি সবই পাটলিপুত্র থেকে বিতরণ করা হয়।"—নথিরক্ষক বুঝিয়ে দিলেন।

ভাস্কর বললেন, "আমরা লেখাগুলি ছেনী দিয়ে শিলা বা স্তম্ভের গায়ে কেটে তুলি। অনেক

ধৈর্য ও পরিশ্রমের কাজ। কারণ লিপিগুলিকে যুগযুগান্ত ধরে স্থায়ী রাখতে হবে তো। ক্ষোদাই কারিগর আবার সবসময়ে লিপির অক্ষর পড়তে পারেনা। অথচ নিপুণভাবে ক্ষোদাই করে।

"যেমন তোমাদের দেশের বর্ণমালা বাঁদিক থেকে ডান দিকে সাজানো হয়। কিন্তু আমাদের লিপি ডান থেকে বাঁয়ে। তুমি তো বিদ্বান লোক, জ্ঞানের সন্ধানে দেশে বিদেশে ঘুরচ, বাণীগুলির মর্ম তুমি নিশ্চয়ই ভাল বুঝবে।"

'আমাদের তরুণ বন্ধুটি বেদের ভাষা—সংস্কৃত অধ্যায়ণ করতে চান, এ ভাষা পণ্ডিতদের," বণিক বললেন "কিন্তু শিলালিপির ভাষা হল সাধারণ মানুষের ভাষা (প্রাকৃত)। আমাদের মহানুভব সম্রাট সর্বজনবোধ্য ভাষায় বাণীগুলি প্রচার করতে চান।"

ছাত্রটি বলল, "শিলালিপির ঐ সর্বসাধারণের ভাষাও আমি পড়তে জানি। আসলে লিপিতো একই, ব্রাহ্মীলিপি। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই ঐ লিপি পড়তে পারে।" সেরেস্তাদার বললেন, "উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি শিলালিপিতে নাকি আর এক রকম হরফ ব্যবহার করা হয়েছে বলে শুনেছি। ওখানকার স্থানীয় লোকে বোধহয় সেই লিপিই ব্যবহার করে-ঐ লিপি ডান দিক থেকে বাঁয়ে লেখা হয় (খরোষ্ঠী)।" ছোট মেয়েটি সাগ্রহে প্রশ্ন করল—"তোমরা সকলেই কি লিখতে-পড়তে পারো?"

তার জবাব দিলেন সেরেস্তাদার। বললেন, "বণিক আর রাজকর্মচারীরা প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানেন। তাদের হিসেবনিকেশ, নথিপত্র ঠিক করে রাখতে হয় তো। বিদ্বান লোকেরা বেদ এবং অন্য ধর্মশাস্ত্র মুখস্থ রাখেন। কিন্তু তবুও প্রতিদিনের প্রয়োজনে লেখাপড়া শেখাটা খুবই দরকারী।"

"তোমরা কী দিয়ে লেখ ? আহা, আমিও যদি লিখতে পারতাম।"

ছাত্রটি হেসে তার কাপড়ের মোড়ক খুলে ভূর্জগাছের বল্কল, তালপাতা, তুলি, তুলট, কালি—সব বার করে মেয়েটিকে দেখাল।

সেরেস্তাদার বললেন, "আগামীকাল সারাদিন আমার প্রচণ্ড খাটুনির কাজ আছে। সম্রাট আমাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর কড়া নির্দেশ, প্রজাদের দরকার নিয়ে যে কোন সময় যে কোন জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি তখন খান, আর ঘুমোন আর প্রমোদ উদ্যানেই থাকুন, দেখা করার কোনো বাধা নেই।

সন্ন্যাসীটি বললেন, "রাজার জীবনে একটাই আনন্দ—দেশের কল্যাণের কাজ করা। তিনি পশুর লড়াই বন্ধ করে দিয়েছেন ; রাজার মৃগয়াও বন্ধ। তিনি অকারণ রক্তপাত একেবারেই চান না—সে মানুষই হ'ক আর পশুই হ'ক।"

ইরাণী ভদ্রলোক আপশোস করে বললেন, "যাই বলুন মশায়, পশুর লড়াই একটা দেখবার জিনিস। সে দেখেছি ছেলেবেলায় তক্ষশিলায়। ওঃ সে কী লড়াই! ষাঁড়ে-ষাঁড়ে, হাতীতে-হাতীতে যুদ্ধ! তবে সবচেয়ে মজার লড়াই হত সেই—একশিংওয়ালা জন্তুদের মধ্যে। এই-চেটা নাক, সেই নাকের মাঝখান থেকে উঠেছে এক লম্বা শিং—আজব জানোয়ার!"

ছোট্ট মেয়েটা উত্তেজিত হয়ে উঠল—"একশিংওয়ালা জানোয়ার কক্ষনো দেখিনি। আর বোধহয় দেখতেও পাবনা ; কী করে দেখব, আর তো লড়াই হবেনা।"

সেরেস্তাদারের সঙ্গী একজন চুপচাপ স্বভাবের কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোক এবার মুখ খুললেন, "আমি ছোটখাট চেহারার গণ্ডার দেখেছি, তার কথা বলতে পারি। জানেন তো হাতীর চাহিদা খুব বেশি—যাতায়াতের ব্যাপারেও যেমন আবার তেমনি চাহিদা স্থলসেনার হস্তীবাহিনীর প্রয়োজনে। উত্তরের জঙ্গলে হাতী ধরার ভার আমার ওপর। এই সব জঙ্গলেই ঐ এক-শিং-ওয়ালা দৈত্যাকৃতি জানোয়ারের বাস। তার চামড়া যেন বর্মের মতন পুরু। হাতী এমনিতে খুবই বুদ্ধিমান জানোয়ার, আবার তেমনই সাহসী। বাঘকেও ভয় করেনা—কিন্তু গণ্ডারকে এড়িয়ে চলে।"

"আমি গণ্ডার দেখব। আমি ভয় পাব না।" ছোট্ট মেয়েটি উৎসাহ-উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল।

সওদাগর চাপা গলায় বললেন, "এই তো বনের মেয়ের মত কথা।"

কিন্তু তাঁর চাপাগলার কথা সরাই রক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর কান এড়াল না। তাঁরা দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের মেয়েকে আগলে রাখতে চাইলেন। কিন্তু ছোট মেয়েটি আদৌ এসব কথা গায়ে মাখল না। সে অল্প হেসে, বেশ খুশি মনেই বললে, "বনের জানোয়ার আমি খুব ভালবাসি।"

বুড়ো চাকরটা এককোণে বসেছিল। সেখান থেকেই গজগজ করে উঠল, "যুদ্ধ হবেনা। মৃগয়া হবেনা। এরকম করলে

আমাদের সম্রাটকে অন্য রাজারা মানবে কেন ? রাজা-রাজড়াদের কারবারই হল যুদ্ধ করা, রাজ্য জেতা। আর শিকার হল গে খেলাধুলোর রাজা !”

সেরেস্তাদার বললেন, “সম্রাটও রাজ্য জয় চান, কিন্তু সেটা ধর্মেরনীতি বিস্তারের সাহায্যে। দূর দেশের রাজন্যদের সঙ্গে তিনি সংযোগ স্থাপন করেন। পশ্চিম দেশের রাজা, লঙ্কার (সিংহল) রাজা এঁরা তাঁর বন্ধু। সম্রাট তাঁদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, যে ন্যায়নীতির মাধ্যমে যে জয়লাভ, তাকেই যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠা বলা চলে।”

“গত বছর সম্রাট তাঁর পুত্র যুবরাজ মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। লঙ্কার রাজা ও তাঁর প্রজারা সবাই নবধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। এই হল সম্রাটের প্রথম ধর্মবিধির দিগ্বিজয়।”

গল্পগুজবের পর এখন আসর ভেঙে গেছে। অতিথিরা সবাই যে যার শয়নাগারে চলে গেছেন। পাথর খোদাইয়ের ভাস্কর তাঁর পশুগুলি আরামে আছে কিনা দেখতে গেছেন।

বিম্বি তার মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, আমি একটু আমাদের বিদেশী বন্ধুকে ঘোড়ার আস্তাবলে নিয়ে যাই? তারপর ছোট ভাইয়ের কিছু লাগবে কিনা দেখে আসব?" তার মা ঈষৎ হেসে ঘাড় নাড়লেন। বিম্বি একছুটে ইরাণী ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

সরাইরক্ষকের পরিবার এবার নিজেদের বাসভবনে গেল। সেখানে ছেলেমেয়েরা তাদের ঠাকুমার সঙ্গে ঘেরা বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। রক্ষকের স্ত্রী বললেন, "সওদাগর ভদ্রলোক বিম্বির দিকে খুব ঘন-ঘন তাকাচ্ছেন, ওঁর কৌতূহলের মাত্রা একটু বেশি। 'আমার ভয় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত হয়ত মেয়েটাকে ওর নিজের ব্যাপার সব খুলে বলতেই হবে। তার ফলে ওই দুঃখু পাবে।"

শাশুড়ি বললেন, "সে ধর, আজ হোক, কাল হোক, বা এক বছর পরেই হোক একদিন না একদিন তো বলতেই হবে। সেকথা ভেবে মন খারাপ কোরো না মা। হাজার হোক আমাদের ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। বিম্বি একটু

আঘাত পেলেও সামলে নিতে পারবে।"

মহিলারা রাত্রে শোবার ব্যবস্থা করছেন, এমন সময় বিম্বি এল, তার দু'চোখ জলে ভরা। বললে, "মা, ওই সদাগর আস্তাবলে বলছিল, আমি নাকি তোমার মেয়ে হতেই পারি না।"

মা বললেন, "আয় এদিকে আয়, বোস্। কী হয়েছে আমায় বলতো মা।"

বিম্বি বসল। কিন্তু মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলে অভিমান করে মার হাতটা ঠেলে দিল। তারপর বলল— "পাথর মিস্তিরি, হাতীধরা আর আমি ইরাণীর ঘোড়া দেখতে আস্তাবলে গিয়েছিলুম।" কথা বলতে বলতে বিম্বির চোখ আবার জলে ভরে উঠল, তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলল। বলল, "আমরা যখন আস্তাবল থেকে বেরিয়ে আসছি, তখন শুনলুম সদাগর রাজার লোককে বলছে— 'ঐ মেয়েটা ওদের মেয়ে বলে তো মনে হয়না। মেয়েটা বোধ হয় অনাথ, বাপ-মা-মরা। হয়ত কোনো জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছে। তারপর মায়া পড়ে গেছে, কাছে রেখেছে। কিন্তু আশ্চর্য, ঝি চাকরের মতন না রেখে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিচ্ছে কেন!"

সব কথা বলে বিম্বি এবার সরাসরি প্রশ্ন করল— "আমি একথা আগে কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, লোকটা যা বলছিল তা ঠিক। কই, আমায় তো তোমার মতন বা বাবার মতন দেখতে নয়। কেন? সরাইরক্ষক ঘরে ঢুকছিলেন, বিম্বির কথা তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন, "বোস্! কী করে আমরা আমাদের মেয়ে পেলাম, সেটা আগে বলা দরকার।" তিনি শান্ত সুরে বলতে লাগলেন— "আজ থেকে কয় বছর আগে, তখনও কারাবান সরাইয়ে আসিনি। তখনো তোমার মার সঙ্গে আমার দেখাও

হয়নি, পরিচয় হয়নি। আমাদের দুই পরিবারের বাড়ি ছিল আলাদা আলাদা জায়গায় শত শত মাইলের তফাতে।

"আমার বাবা সম্রাটের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তখন উজ্জয়িনী নগরীর রাজ প্রতিনিধির শাসনকর্তা। আমার মা, তোমার ঠাকুমা, তখন ছিলেন সুন্দরী দিদির পরিচারিকা— দিদি ছিলেন এক ধনী শ্রেষ্ঠীকন্যা। আমাদের সম্রাট তখন যুবরাজ, দিদিকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু যখন রাজা হয়ে পাটলিপুত্রে এলেন, তখন তাঁকে ছেড়ে আসতেই হ'ল। তারপর আমার বিয়ে হল, নিজের সংসার হ'ল, বাড়িঘর হল।

"এরপর আমার রাজার সৈন্যদলে যোগ দেবার ডাক এল। আমি যুদ্ধ সেরে নিরাপদে ফিরলাম। কিন্তু মড়কে আমার বৌ-ছেলেমেয়ে মারা গিয়েছিল। কেবল আমার মা বেঁচে ছিলেন, আমাকে দুঃসংবাদ শোনাতে।

"আমি একেবারে একা আর নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। তবে ইতিমধ্যে অনেক দূরদেশে যুদ্ধ করবার ডাক আসাতে আমি বেঁচে গেলাম। আর সেই যুদ্ধই আমাদের সম্রাটের জীবনের শেষ যুদ্ধ—কলিঙ্গের বনাকীর্ণ ভূমির ওপর।

"সে এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত লড়াই। উভয় পক্ষের সৈন্যরাই লুণ্ঠন, অত্যাচার ঘর জ্বালানো এবং নির্বিচারে ঘরে ঘরে নরহত্যা চালিয়েছে। চাষী আর বনবাসীদের দুঃখকষ্টের আর অবধি রইল না। সেই সময়েই তোমার মা গৃহহারা হয়ে পড়েন, আর তুমিও, তখন আর তোমার কতটুকু বয়স, সবে হয়ত মাস আটেক, বাড়িঘর হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছ।"

তার কথার খেই ধরে এবার তার বৌ গল্পটা তুলে নিল, "সে সময় আমারও অন্য বাড়ি, অন্য সংসার। আমার স্বামী ছিলেন চাষী, তিনটি ছেলে মেয়ে, একটি সদ্যজাত শিশু। আমাদের ক্ষেত আর কুটির ছিল বনের ধারেই। কিছুকাল আমরা বেশ শান্তিতেই ছিলাম। একদিন একদল সৈন্য এসে আমার স্বামী আর সন্তানদের হত্যা করল, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল। আমার ওপর কোনও অত্যাচার করার আগেই তাদের ডেকে নিয়ে গেল। তারা চলে গেল।

"আমি একেবারে অসহায় আর বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে আছি। এমন সময়ে একটা কচি মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কোলের কাছে এগিয়ে এসে খুব করুণ স্বরে কাঁদতে লাগল। কোলে নিতেই চট করে ঘুমিয়ে পড়ল। সরিয়ে দিতে গেলেই আঁকড়ে ধরে, কিছুতেই আমায় ছাড়তে চায় না।

"তারপর দিন গড়িয়ে চলল। ছোট্ট কালো চুলের মেয়েটা দিনে দিনে আমার বুকের মণি হয়ে উঠল। আমরা দুজনেই তখন বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকি।

"একদিন বনের ধারে খাবারের খোঁজে গেছি; হঠাৎ পাথরে পা পিছলে পড়ে গেলুম। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম একজন লোক আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার মুখে জল দিচ্ছে।'

"আমি সভয়ে তার দিকে তাকাতেই, মানুষটি বলল, 'ভয় পেওনা। আমি মেয়েদের কি ছোট ছেলের কোনও ক্ষতি করি না। শিশুর কান্না শুনেই আমি এসেছি'। ইতিমধ্যে মেয়েটাকে খিল খিল করে হাসতে দেখে, লোকটি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'একি তোমার মেয়ে?'

"আমি বললাম, সৈন্যরা আমার নিজের বাচ্চাদের মেরে ফেলার পর ও-ই আমাকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু কী করে যে ওকে বাঁচাব, তা জানিনা। আমার কোন উপায় নেই। আপনি ওকে নিয়ে যান, বাঁচান।"

পান্থশালার রক্ষক এবার আবার গল্পের সূত্র নিজের হাতে নিলেন, "আমি তখন বললাম, 'আমি একা একটা বাচ্চার দেখাশুনা কী করে করব? তবে তুমিও যদি আমার সঙ্গে আস, তাহলে আমি দুজনকেই কিছু দিন দেখাশুনো করতে পারি। তারপর তোমার শরীরে শক্তি ফিরে পেলে,তখন চলে যেও।"

"তাই তখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকতে লাগলাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, আমি তোমাদের দুজনকে আমার বাড়িতে আমার মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তোমাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনেই তোমাদের বুকে জড়িয়ে

ধরলেন। তোমার মাকে নিজের মেয়ের মতন, তোমাকে নিজের নাতনির মতন আগলে ধরলেন।

"এর অল্পদিন পরেই সম্রাট প্রভুবুদ্ধের ধর্মমতে দীক্ষিত হলেন। নরঘাত আর যুদ্ধজয় জনিত মানুষের অপরিমিত দুর্দশায় বিচলিত হয়ে তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করার সংকল্প নিলেন। তাঁর একটি শিলালিপিতে মুদ্রিত বাণীতে বলা হয়েছে, 'সেদিনের যুদ্ধে যত লোক নিহত বা বিপন্ন বা বন্দী হয়েছে, আজ তার এক শতাংশ বা এক সহস্রাংশ মানুষেরও যদি ঐ রকম দুর্দশা ঘটে, তাহলে রাজা গভীর দুঃখ পাবেন।' তিনি এরপর ধর্মশাসনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর সারা সাম্রাজ্যে এক নতুন জীবনের সূত্রপাত ঘটল। যখন শুনলাম, রাজকর্মচারীরা একটা বিশাল পান্থশালার জন্যে একজন গৃহস্থ তত্ত্বাবধায়ক সন্ধান করছেন, আমি ঐ কাজের জন্যে আবেদন করলাম, এবং কাজটি আমি পেয়ে গেলাম। এখানে আমরা সত্যই নবজীবন শুরু করেছি। তোমার ঠাকুমা, তোমার মা আর আমি। এর পরেই তোমার দুটি ছোট ভাই হল। পরিবার বাড়ল।"

বিম্বি নিঃশব্দে এই দীর্ঘ কাহিনী শুনল। শেষ হলে সে গম্ভীর সুরে বলল, "তবে তো লোকটি যা বলেছে, সে সব সত্যি। আমি তোমাদের মেয়ে নই? আমার মা-বাবা কে তাও জানিনা।"

তখন পিতামহী বললেন, "জানোনা? কেন? মা-বাবার কাজই হল শিশুর পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধান করা। তাকে বিপদ থেকে বাঁচানো। তা দেখ, তোমার পালিত মা তোমায় না বাঁচালে বনের ভিতরে কে তোমায় বাঁচাত, হয়ত তুমি মারা যেতে। তারপর আমার ছেলে যদি সেদিন তোমাদের নিয়ে এসে আশ্রয় না দিত, তোমরা দীর্ঘদিন বাঁচতে পারতে কি? ছোট্ট অনিকেট জেগেই তোমাকে খোঁজে। ওরাই কি তোমার বাবা মা-ভাই নয়?"

বিম্বি বলল, "হাঁ ওরাই আমার মা-বাপ-ভাই।" হাসিমুখে সে ঠাকুমার কোলে মুখ লুকোল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে বলল, "ঠাকুমা, কাল আমায় খুব ভোরে ডেকে দিওতো। কাল সকালে বাবাকে-মাকে কাজে সাহায্য করতে হবে—কাল বড় বেশি লোকের ভিড় হবে, অনেক কাজ। আর, ঐ হাতী ধরে যে লোকটা, সে আমাকে কথা দিয়েছে—একশিংওয়ালা পশুর আরও গল্প বলবে।"

কাবেরীপত্তনমে বেচাকেনা

চোল রাজাদের রাজধানী কাবেরীপত্তনম্। দিনে দিনে শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। সেদিন শহর খুব সরগরম। বন্দরে একটা বড় জাহাজ ভিড়েছে। জাহাজে রকমারী দামী দামী মালপত্র এসেছে। মাল খালাস হচ্ছে। এরপর জাহাজের খোল আবার বোঝাই হবে এখানকার পণ্যসামগ্রী দিয়ে। সুরক্ষিত প্রাচীন নগরী পুহার। তার চৌহদ্দীর ভেতরেই রাজপুরী। ধনীদের সুরম্য হর্ম্য ; শহর থেকে লোক বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝ শহরের বাজার পাড়ায়, সেখান থেকে সমুদ্দুরের ধারে সৈকতপুরীর দিকে। এপাড়ায় গুদাম, আড়ত, জেটি আর শুল্কঘাটি পার হলে ঐ পারে বিদেশীদের বসতি, নাবিক আর নানান দেশের শেঠী সওদাগরের আড্ডা। নদীর মোহনায় বন্দর—জাহাজ, নৌকো, বজরায় ভিড়ে ভিড়। খানিকদূরে খোলা দরিয়ার ওপর খাড়া আলোকস্তম্ভ—মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

বেলা দুপুর। সাতটি জোয়ান ছেলে একসঙ্গে সমুদ্রের ধারে জড়ো হয়েছে।

তারা সমুদ্রের পাড়ে ইটের উঁচু চাতালে দাঁড়িয়ে নিচের ভিড়ভাট্টা লোক-জনের ব্যস্ততা দেখছে। তাদের সাতজনের নাম—সত্যন, পরণার, সত্তবন—

এরা তিন জনেই সম্পন্ন সওদাগর শ্রেণীর ছেলে, শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তার ছেলে পেকন। আপ্পার বাবা জ্ঞানভবনের পণ্ডিত। রাহুল জাহাজের নৌ-অধ্যক্ষের ছেলে। আর একজন হল বল্লুবর—তার মা-বাবা দুজনেই কবি।

এইসময় কুম্ভকার পুত্র ইলম্‌কে আসতে দেখা গেল। তার কাঁধে ঝুড়ি। ঝুড়ির ভারে তার কাঁধ দুটো নুয়ে পড়েছে। বল্লুবর তাকে হাঁক দিলে, "ওরে ইলম, এই ইলম এদিকে আয়। হাঁড়ি কলসি নামিয়ে রেখে একটু বোস। আয় সবাই একটু মিষ্টি খাই।"

ইলম হাঁপাচ্ছিল। কাঁধ থেকে বাঁকটা নামাতে পেরে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বেশ একটু শ্লাঘার সুরেই বললে, "আজ সকাল থেকে দশটা কলসি বিক্রী করেছি। তারপর বাজার গেছি, চাল কিনেছি। নুন কিনেছি, সুঁটকি মাছ কিনেছি—মার জন্যে মধু কিনেছি। কেনাকাটার পরেও কিছু কড়ি হাতে আছে।"

বল্লুবর জপ করার মত করে বলতে লাগল, "আহা কলস, ঘট! উজ্জ্বল কাল, লাল, ধূসর; আর কী সুন্দর কত রকমারী গড়ন। বাহারে সরা, কোনোটার মুখ ফাঁদালো, কোনোটা সরু গলা। বাঁচবার আহার তাতেও লাগে আবার মৃতের ভস্মাধার—তাতেও লাগে।"

"হয়েছে, থাম্ তো!" সত্তুবন ধমক দিল, একটা পাতার ওপরে কটা মিঠাই নিয়ে ও ইলমের হাতে দিল। তারপর বল্লবরকে বলল, "তোর ঐ

শ্মশানের কলসির গান থামাতো। আমোদ ফূর্তির দিনে ওসব ভাল লাগে না। তাছাড়া, ইলমের বাবা মোটেই ওরকম জিনিস বানান না।''

ইলম্‌ বলে, ''আর একজন কারিগর আছেন, তিনি শ্মশানের কলসি গড়েন।...বাঃ মিষ্টিগুলো দারুণ্‌ লাগছে তো! বাজারের দোকান থেকে আনা নাকি?'' সহ্‌বন বললে, ''না। মা বানিয়েছেন। বাবা এই মিষ্টি খেতে ভালবাসেন। বাবা গতকাল সফর থেকে ফিরে এলেন তো। এবার অনেক দূর গিয়েছিলেন। উত্তর থেকে মাল আনতে গিয়েছিলেন—যবনদের (গ্রীক ও রোমান) জাহাজে সওদা করার জন্যে।''

''তোর বাবা এবার কিসে গেলেন-ডাঙায় না জলপথে?''—রাহুল জানতে চাইল। সহ্‌বন বললে, ''এবার গিয়েছিলেন কাছ দরিয়ার জাহাজে।''

ইলম জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা, লোকে কি সত্যি সত্যিই ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঐ পাহাড়গুলোর ওপরে যায়?''

আপ্পার জবাবে বললে, ''সে আর নতুন কী। দক্ষিণাপথ আর উত্তরাপথের মধ্যে বরাবরই তো যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে।''

তারপর সহ্‌বনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, ''হ্যাঁরে, তোর বাবা তো আগে ডাঙাপথেও গেছেন এসেছেন, নারে?''

সহ্‌বন বললে, ''হ্যাঁ, ঘোড়া আনতে যান যখন। সুতী কাপড়, মশলা, মুক্তো, শাঁখ, আমাদের দেশের রাণীমোতী— এই সব নিয়ে যান আর ঘোড়া, মণিমাণিক্য, ওষুধ আর গন্ধদ্রব্য—উত্তরের নানা জায়গা থেকে এইসব জিনিস নিয়ে ফেরেন। ঘোড়ার চাহিদা থাকে রাজার আর সৈন্যদলের, আর ধনীলোকেরা কেনে হীরে জহরত, ওষুধ আর গন্ধদ্রব্য; তারা যবন বণিকদের কাছে ঐ মালই আবার বেচে।''

আপ্পার বললে, ''এই যে পণ্যের আর ভাবনাচিন্তার বিনিময় এ কত শতাব্দী ধরেই হয়ে চলেছে। দক্ষিণের মুক্তোর খবর মগধের মৌর্যেরাও জানতেন। মহান মৌর্য সম্রাট অশোক আমাদের দেশে কেন, লংকা পর্যন্ত তাঁর শিক্ষকদের পাঠাতেন—তাঁরা এদেশের লোককে ধর্ম-উপদেশ দিতেন, আবার মানুষ কিংবা পশুপক্ষীর চিকিৎসার জন্যে ভেষজবিদ্যাও তাঁরা শেখাতেন।''

সমুদ্রের ধারে একটা ঢেঙা ছেলেকে দেখে বল্লুবর হঠাৎ খুব জোরে হাতপা নেড়ে তাকে ইশারা করতে লাগল। বললে, ''ঐ দেখ, করী, টিয়াপাখী ধরে,

শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেচারা, দেখে মনে হচ্ছে খুব মন খারাপ। দাঁড়া ওকে ডেকে আনি। সতু, ভাই ওকে কিছু মিষ্টি দিস। আমার ভাগেরটাই দিস বরং।"

কালো, লম্বা, রোগাটে একটা ছেলে, পরণে যৎসামান্য কাপড়, প্রায় সব সময়েই মুখে একটু হাসি লেগেই থাকে—কাঁধের ওপর টাঙানো বাঁশের খাঁচায় একরাশ পোষা বুলবুলি, তোতা, আর এক কাঁধে আর একটা সবুজ চন্দনা তার গলায় গোলাপীকণ্ঠি। করী পাখী বেচে। বল্লুবর ওর কাছে দৌড়ে যেতেই করী সরে পড়ছিল। কিন্তু বল্লুবর ওর হাত ধরে ওকে জোর করে টেনে আনতে আনতে ওর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

বল্লুবর ওকে নিয়ে এসে নিজের পাশে বসাল। করী সহজে মুখ খুলবেনা জানে, তাই ওদের আগের কথার খেই ধরেই কৌশলে কথা বলে চলল। "......... হ্যাঁ, তারপর পেকন যা বলছিলি, রাজার খাজনার দপ্তরে তোর বাবাকে কী কাজ করতে হয়, আর মালপত্রের কথা ......।"

"বন্দর শহরের বড় সড়কে, সদাগরী মাল গুদামের বাইরে মাল পড়ে থাকে, ওজন হয়, রাজার সীলমোহর লাগে—রাজার সীলমোহর দেখেছিস তো—একটা ভয়ংকর দেখতে বাঘ তার যাড়া লেজ—সেই মোহর লাগানো হবে, তারপর জাহাজে তোলার আগে সব মালের পাওনা গণ্ডা আদায় হবে।" পেকন বন্ধুদের বুঝিয়ে বলে চলে, "যে মাল জাহাজ থেকে এখনো খালাস করা হয়নি, তারও দাম ঠিক হবে, তাতেও মোহর ছাপ লাগবে, তবে সওদাগর তার জিম্মায় মাল পাবে।"

কুমোরের ছেলে বললে, "একটা কথা আমি বুঝতে পারি না। সহুবনের বাবার মতন বাদশা সওদাগরেরাও যবন জাহাজে মাল সরবরাহ করার জন্যে উট ঘোড়ায় জাহাজে চড়ে দূর দূর রাস্তা পাড়ি দিয়ে মাল গস্ত করতে যান কেন। যবনরা তো নিজেরাই মাল কিনতে আসে।"

সহুবন বলে, বলেছ ভালই। বাবা কতবার গঙ্গা-ইরাবতীর মোহনা পেরিয়ে খাঁড়ি পার হয়ে বড় সমুদ্রে পূর্বদ্বীপমালা পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন— ঐ যবনদের কাছে সরবরাহ করার জন্যে মাল কিনতেই যাওয়া। ওরা চায় লঙ্কা, মুক্তো………"

"আর টিয়াপাখি ……" ওর কথার মাঝখানেই বল্লুবর বলে উঠল। ভাবল করী তাতে কথাবার্তায় যোগ দেবে। কিন্তু করী কেবল একটু ভুরু কোঁচকাল।

"হ্যাঁ, টিয়াপাখি, ময়ূর আর বাঁদর …" পেকন ফিরিস্তি দিয়ে চলল……
"মিহি মসলিন, হাতীর দাঁতের জিনিস, আর কচ্ছপের খোলা, আর বৈদূর্যমণি, যা দিয়ে ধনী যবনরা মোহর ছাপ দিতে ভালবাসে। তারা বেশিরভাগই এসব জিনিসের দাম সোনায় দেয়। পেকন বলে, "ওরা মাল বেচতেও আসে। ঠাণ্ডা আঙুরের মদ ভর্তি মাটির কলস তার দুদিকেই হাতল, নানান মাটির শিল্পকাজ, কাঁচের বাসন আর বাহারে পাক দেওয়া বাতি—লণ্ঠন।"

সত্থবন বলল, "তা আনে বটে। তবে ওদের মাল আমাদের যত দরকারে লাগে, আমাদের মালের চাহিদা ওদের কাছে তার চেয়ে ঢের বেশি। তাই আমাদের বণিকরা আমাদের রাজার সম্পদ বাড়াবার জন্যে দেশ-বিদেশে যান। লঙ্কা যেমন দেশের সওদাগরী আড়তে পাওয়া যায়, তেমনি পূব দেশ থেকেও আসে। সেখানে মশলা প্রচুর জন্মায়। বাঘের বা চিতার চামড়ায় সৈন্যদের বর্ম হয় — আমাদের সৈন্যদেরও লাগে, আবার যবনদের দেশেও রপ্তানী হয়। আমাদের শ্রেষ্ঠীরা আমাদের জঙ্গলের শিকারীদের কাছ থেকে ছাগল—ভেড়ার লোমশ ছাল, হাতীর দাঁত কেনেন, আবার কচ্ছপের খোলা যেমন আমাদের নিজেদের সাগরতীরে পাওয়া যায়, তেমনিই আবার পূর্বদ্বীপপুঞ্জের (মালয় দ্বীপমালা) উপকূল থেকেও আনতে হয়।"

এবার গল্প বলার পালা সত্যেনের। সে বলল, "বোঝাই যাচ্ছে যে এই সব মালপত্র কিংবা আমাদের মিহি সুতোর কাপড়—আমরা না বেচলে যবনদের পাবার কোনই উপায় নেই। তাই তারা বেশি দাম দিয়ে এই সব জিনিস কেনে। আর তাদের সোনায় আমাদের কোষাগার ভরে ওঠে। আবার চাল, মাছ, তিলের তেল, কলা আর কাঁঠাল দরকার হয় যেমন— নাবিকদের খাবার জন্যে, তেমনই দরকার হয় শহর—গ্রামের বাসিন্দাদেরও।"

ইলম উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, "তা সব খাবার জিনিস যদি মাঝিমাল্লারাই নিয়ে যায়, তাহ'লে আমরা গরীব লোকেরা চাল-মাছ কোথায় পাব?" শুনে করী আবার ভ্রূকুটি করল, আর ঘাড় নাড়ল, মনে হল কথাটা তার মনে ধরছে।

"ভেবোনা, ভেবোনা," পেকন বিজ্ঞের মত জবাব দিল,—"ওর অভাব হবেনা। সকলের খাবার মত যথেষ্ট খাবার দেশে আছে। কাবেরী নদীর ধারের মত এমন ভাল ধানের জমি পৃথিবীর কোথাও নাই। আর আমাদের সমুদ্রের উপকূলের জলে অফুরন্ত মাছের ঝাঁক।"

হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল করী, "যবনগুলো নিজের দেশে বসে থাকতে পারেনা ? এখানে আসে কেন ?"

"কেন বল তো ? কী হয়েছে ! তোমার পাখি নিয়েই কিছু গোলমাল হয়েছে, বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার বলতো, খুলে বল আমাদের"—আপ্পার সহানুভূতির সুরে বলে।

করী বললে, "তোমাদের যবন বন্ধু আমার তোতা নিয়ে চলে গেছে," উত্তেজনায় ওর গলা কাঁপছে।

ছেলেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। ইলম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,—"কোন্ যবন ? কী করে নিল পাখি, কেড়ে নিয়ে গেল নাকি ?" রাগে করীর চোখ জ্বলছে। বললে, "না আমার বাপ লোভে পড়ে আমার আদরের পাখিটা বেচে দিয়েছে।" ওর গলা বুজে এল।

আপ্পার জোর দিয়ে বললে, "আগাগোড়া সব কথা বুঝিয়ে বল।" এবার করীর মুখ দিয়ে কথা ঠেলে বেরোল। "কাল অব্দি বেশ সুখের দিন গেছে আমার। বাবা বাঘ শিকার করে বাড়ি ফিরেছে। কোন আপদ-বিপদ হয়নি, তাই মা কাক খাইয়েছে। এখন তোতাদের জোড় খাবার মরশুম। আমার চারজোড়া তোতা বড় করেছি—শহরে নিয়ে বেচব বলে। সেদিন বিকেলে আমাদের গাঁয়ে নুনের বেপারী এল। লোকটা ওই অঞ্চলের সব পাহাড়ী গাঁয়ে নুন আর সুটকি মাছ বেচে, জংলীদের কাছ থেকে মৌচাক, কাঁঠাল, মিষ্টি আলু, আর তিতকুমড়ো এইসব হালকা মাল কিনে শহরে ফিরে আসছিল। সেই আমার বাবাকে বলল, বন্দরে যবনদের জাহাজ ভিড়ছে।

বললে, 'বড় শহর তো জন্মে দেখনি। আমার সঙ্গে চল। কবে অন্য ব্যাপারীরা তোমার গাঁয়ে এসে তোমার মাল কিনবে তার জন্যে বসে না থেকে, তোমার বাঘছাল-টাল নিয়ে নিজেই চল না।' লোকটা ঐ কথা বললে বলে আমরাও চলে এলুম।" বলতে বলতে করীর গলা ধরে এল। একটু দম নিয়ে আবার বললে, "শহরে পৌছে, শুল্কঘরে গিয়ে আমরা বাঘ-ছাল বিক্কিরির বন্দোবস্ত করলুম। জেটিতে অনেক মাল্লা ছিল, যবনরাও ছিল, অন্যরাও—তারা সবাই আমার খাঁচার টিয়া কেনবার জন্যে
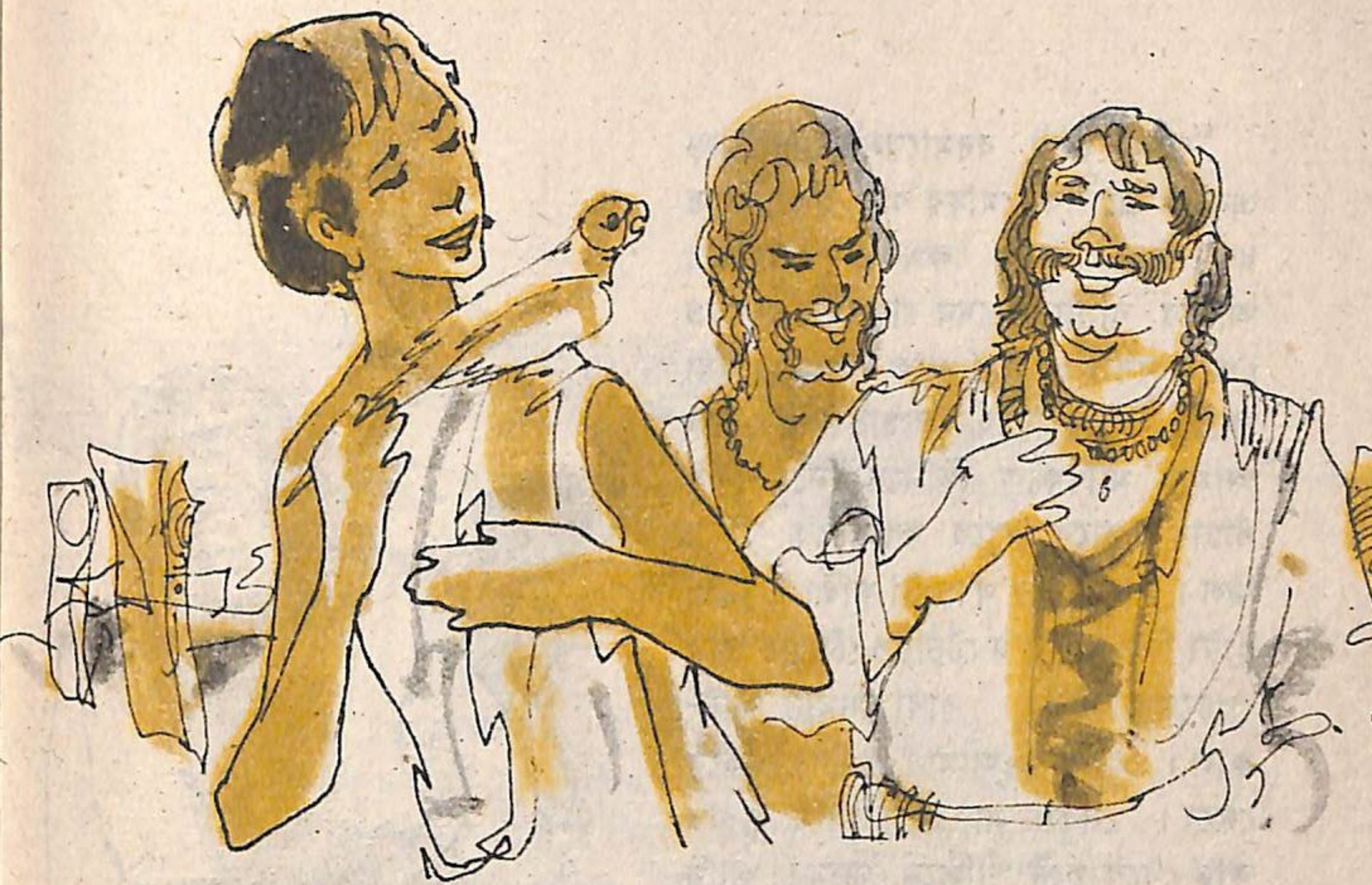
ঝুলোঝুলি করতে লাগল, খাঁচাটা আমার মা হাতে তৈরী করেছে। ইতিমধ্যে এক যবন সওদাগর এগিয়ে এল। তার গায়ে একটা মোটা ঝোলা-জামা, কোমরে ফেরতা দেওয়া কাপড়—দেখে মনে হল বড়লোক...”

করী একবার চুপ করতে পরণার মোলায়েম সুরে বলল—“হু, যবনেরা অনেক কাপড় পরে। ওদের বোধহয় ঠাণ্ডার দেশ। তা একরকম ভালই, আমাদেরই লাভ, আরো বেশি কাপড় বেচতে পারব।” করী আওয়াজ করে, ঢোঁক গিলল তারপর শুরু করল, “আমার চন্দনা আমার কাঁধের ওপর বসে বুলি কাটছিল। পাজী যবনটা এসে বললে, “এটা আমি কিনব।” বাবা বললেন, “এটা বিক্রীর না, ওর খাঁচা নেই।” তাতে লোকটা বললে, “তাতে কী হয়েছে, যে কোন খাঁচায় পুরে দাও, তবে ঐটেই চাই। আমার দেশের একটা ছেলের শয্যাশায়ী অসুখ, তার জন্যেই কিনছি।” ‘না, না’ বলতে বলতে আমি আমার কাঁধের ওপর বসা মাণিককে নিয়ে ছুটে পালালুম।

"তখন সেই বদমায়েসটা এত বড় একটা রূপোর মোহর বার করল, অত বড় সিক্কা আমি কখনও দেখিনি। আমার বাবাকে যেন রাক্ষসের লোভে পেয়ে বসল,—খাঁচা খুলে একটা টিয়া পাখি উড়িয়ে দিয়ে, আমার কাঁধ থেকে আমার মাণিককে ছিনিয়ে নিয়ে সেই খাঁচায় তাকে পুরে যবনটাকে দিয়ে দিল। সওদাগর খাঁচাটা ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁটা দিল। আমি চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছনে ছুটছিলুম। বাবা আমায় আট-কাল। বললে, আমায় মেঠাই কিনে দেবে। সেকথা না শুনে আমি বাবার কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে গেলুম। আমি সেই থেকে বাড়ি যাইনি, কেবল বালির চড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর আমার পাখি-টার কথা ভাবছি।"

পেকন বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, "যবন পাখির যত্ন করবে'খন। ওদের টাকা আছে তো। ওদের পাখি পোষার রূপোর তারের খাঁচা, হাতীর দাঁত আর কাছিমের খোলা দিয়ে সাজানো আমাদের কারিগরেরাই বানিয়ে দিয়েছে কত, আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

করী বলল, "আমার মাণিক রূপোর খাঁচা চায়না। সে আমার কাঁধে বসবে।"

"কখন হ'ল ব্যাপারটা?" — সত্যন জিজ্ঞাসা করল।
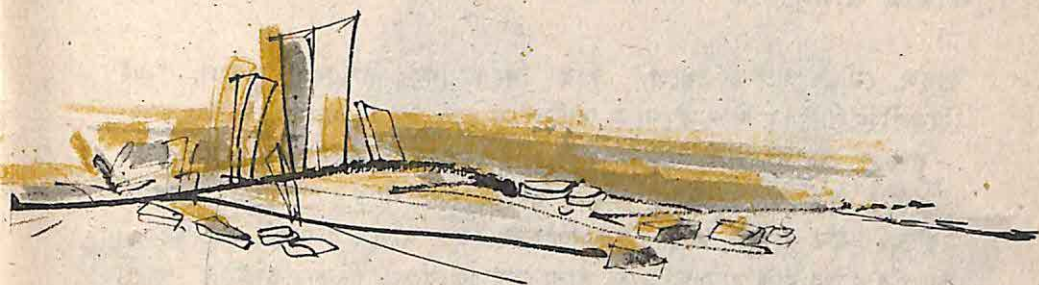
"আজই ভোরবেলায়। নুনের ব্যাপারীর গাড়ীতে না চাপলেই হত। তাহলে আর যবনের সঙ্গে দেখা হতনা। আমার বাবারও আর চাঁদীর মোহরের জন্যে অমন রাক্ষুসে খিদে হতনা। মোহর কি খাবে?"

বল্লুবর মমতার সুরে বললে, "সকালে কিছু খেয়েছ?"

"খাব কী করে? আমার গলা বুজে আসছে। আমার পাখিটা কী খাচ্ছে কে জানে?"

সত্বন সদয় কণ্ঠে বলল, "নাবিকরা তাদের পাখিকে ছোলা বাদাম খাওয়ায়। তোমার মাণিক ভালই খেয়েছে নিশ্চয়। তুমি একটু মিষ্টি মুখে দাও, করী।"

"আমায় বোলোনা ভাই, সত্বন, আমার গলা দিয়ে নামবেনা। আমি যাই, সাগরতীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীল জলের দিকে তাকিয়ে থাকিগে। ঐ পথেই আমার মাণিককে নিয়ে যাবে। রোজ সকাল হলেই মাণিক আমার নামধরে ডাকে। জানো, আর কোনদিন ওর ডাক শুনবো না, একথা আমি যেন ভাবতেও পারছিনা। আহা কোনো জাহাজে যদি খাটিয়ে ছেলের দরকার থাকে, তাহলে আমি চাকরী নিয়ে চলে যাই। গাছে চড়ে পাখি পাড়ার বদলে জাহাজের মাস্তুলে চড়ব। যাক, বাবা নিজেই যাক জঙ্গলে পাখি ধরতে।"

বল্লুবর পরম স্নেহে বললে, "আমি তোমায় আমায় ছেড়ে যেতে দেবনা, তোমায় ধরে রাখব।"

রাহুল নৌ-অধ্যক্ষের ছেলে, তার দিকে ফিরে পরণার বললে, "এই বিদেশীগুলো কেন পশ্চিম থেকে তামিল্ ভূমিতে আসে, বলতে পারিস ?"

রাহুল শুরু করল, "তিন কিরীটী রাজার রাজত্বে যবনরা বাণিজ্য করে। চেরবন্দর মুজীরি, সরাসরি তাদের যাত্রাপথেই পড়ে। যবনরা সেখানে মরীচ কিনতে যায়— তাদের ফিরতি জাহাজের অর্দ্ধেক সওদাই হল মরীচ। তারপর রত্নের রাণী মুক্তোর জন্যে তারা যায় কোরকাঈ (কোলকাঈ)। পাণ্ড্য রাজ্যের সেরা বন্দর কোরকাঈ— মুক্তো আর শঙ্খের বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র।"

বাকিটা বোঝাতে লাগল সত্তুবন, "তামিল ভূমির সৌখীন মালের ওপর যবনদের বেজায় লোভ। আর পূব-পশ্চিমের মধ্যে জলপথের যাতায়াতের রাস্তায় আমাদের চোল-উপকূলটা এমন চমৎকার এক মাঝামাঝি জায়গায়, যে মালপত্র সরবরাহের পক্ষে খুবই উপযোগী। আমাদের প্রধান রপ্তানীপণ্য হচ্ছে মিহি মসলিন কাপড় ; যবনদের দেশে তো তুলোর গাছ হয়না, ওরা তুলোকে বলে— পশম গাছ। কিন্তু এই বেসাতিতে এত লাভ যে চোল দেশের সবরকম পণ্য ছাড়াও, আমাদের উৎসাহী বণিকরা পূবের দ্বীপ থেকে কাছিমের খোলা, মরিচ, মশলা, আর উত্তর থেকে মণিরত্ন আর হাতীর দাঁত কিনে যবনদের কাছে আবার বিক্রী করে থাকে।"

পেকন বলে, "কাবেরীপত্তনমে যবন আর অন্য বিদেশী আছে-অনেক। তবু, আমার বাবা বলেন যে যবন বণিকরা আরো উত্তরাঞ্চলে নিজেদের বসতি করেছে। যবনদের বাড়িঘর আছে, জেটি আছে, পোদোকে জাহাজঘাটা আছে— বছরের মধ্যে বেশ ক'বার ওদের জাহাজ এই বন্দরে আসে, কারণ আমাদের বন্দর হল শান্ত বন্দর।"

"আচ্ছা এই রাক্ষস যবনগুলো কি মরিচ খায় নাকি, যেমন আমরা ভাত খাই ?" করী হঠাৎ ব্যঙ্গ সুরে প্রশ্ন করল।

পরণার বলল, "ওদের খাবার নিশ্চয় খুবই বিস্বাদ আর অখাদ্য। নইলে ওদের লঙ্কা-মরিচের ওপর এত টাঁক কেন ?"

ইলম চিন্তান্বিত। বললে, "গরীব-গুর্বোদের ফেন ভাতের মধ্যে একটু লঙ্কা-মরিচ মেশালে স্বাদ বাড়ে। তাও যদি বিদেশিরা সব নিয়ে চলে যায়, আমাদের খাবার কী থাকবে ?"
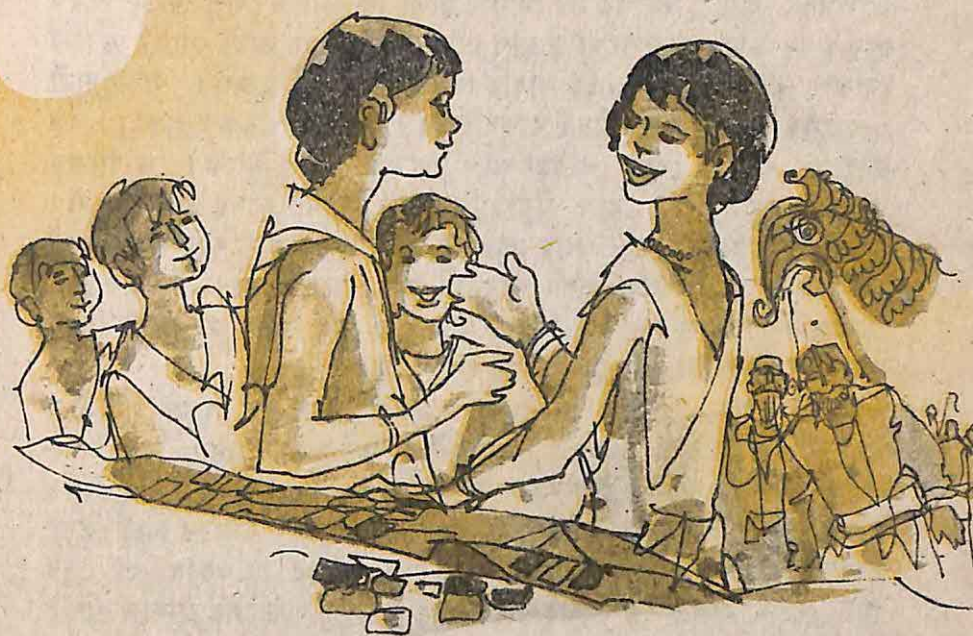
সত্যন বললে, "ও প্রচুর পাওয়া যায়। তামিলদেশে মরিচের লতা অনেক জন্মায়। যবনরা যে মরিচ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে, সে হল সাদা মরিচ। আমাদের কারিগর-বাড়িতে ঐ মরিচ বড় একটা ব্যবহার করা হয় না।'

করী অবজ্ঞার সুরে বলল, "যবনগুলোর নিজের দেশে কি কিছুই হয় না?"

পেকন বললে, "যবনরা অতি কৌশলী কারিগর। তারা রাজপুরীর জন্যে বাতি তৈরী করে! তাছাড়া, পুহারের প্রমোদকাননে রাজার অলিন্দ যারা সুন্দর করে সাজিয়েছেন, তাদের মধ্যে আমাদের লোকেদের সঙ্গে যবন কাঠের মিস্ত্রীরাও অনেকে আছেন।"

রাহুল বললে, "ওরা ভাল জাহাজও বানায়। পৌদৌকের পথে মহা-সমুদ্রগামী নৌবহর দেখা যায়।"

"আমাদের জাহাজগুলো কত বড়, তাতে কত লোক ধরে?" পরণার প্রশ্ন করে।

রাহুল বলল, "বড় জাহাজ তৈরী হয় দীর্ঘ পাড়ির জন্যে। তাতে মাঝিমাল্লা আর সওদাগর সব মিলিয়ে দুশো কি তারও বেশি যাত্রী ধরে। তার ওপর তাতে পাঁচশো গাড়ি মাল ধরে, অনেক সময় ভারী কাঠের গুঁড়ির বোঝাও থাকে, আরও থাকে খাবার জিনিস আর পানীয় জল। সাগরগামী জাহাজের তুলনায় উপকূলীয় (কাছদরিয়ার) জাহাজ অনেক হালকা। বড় জাহাজে এমুড়ো থেকে ওমুড়ো অব্দি অনেক কামরা থাকে। জাহাজের গলুইয়ের গড়নে হাতী, মোষ, টিয়াপাখি কিংবা ময়ূরীর মুখের ছাঁদ বসানো। খুব উচু মাস্তলের চুড়ো আর তার বড় বড় পাল থাকলে বাতাস আটকায় বটে, তবে ঝড় উঠলে ওসব অকেজো হয়ে যেতে পারে। আবার তার চেয়েও খারাপ হাল হয় যদি বাতাস একেবারে পড়ে যায়, জাহাজকে তখন সাগর জলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়— অচল হয়ে।"

পেকন বলল, "রাজার নৌবিভাগের তত্ত্বাবধায়করা খুব বিচক্ষণ। তাঁরা ভাঙাচুরো জাহাজের চমৎকার মেরামতীর বন্দোবস্ত করেন। তবে বার-দরিয়ায় জাহাজ অচল হলে সাহায্য পৌঁছে দেবার কোনই উপায় নেই ; হয়ত মাস্তুল আর পাল ঝোড়ো হাওয়ায় আর পাগলা ঢেউয়ের চোট লেগে বিকল হয়ে গেলে আর করার কিছু থাকেনা। তবুও আকছার এই সুদূর পাড়ি দেওয়া হয়ে থাকে। আর বলতে নেই আমাদের চোলের জাহাজ প্রায়ই

ভালয় ভালয় যাত্রা শেষ করে ফিরে আসে। অবিশ্যি আরব বা যবন জাহাজীরাও কম যায় না।"

সত্যন বলল, "আচ্ছা মহাসাগরে তো বাঁধা রাস্তা নেই, নাবিকরা কী করে জাহাজ চালায়, বলতো।"

রাহুল বলে, "খোলা সমুদ্রের ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয়, তার কিছু গোপন তুক আছে। নাবিকরা সেই তুক কিছুটা শিখে ফেলে। মৌসুমী হাওয়া, একটা মৌসুমে বিশেষ একটা দিকেই বয়, আবার অন্য ঋতুতে অন্য দিকে বয়। সাগর পাড়ি দেবার সময় নাবিকেরা এটা খেয়াল রাখে। সেই হিসেব করে চলে।"

ইলম শহরের বাসিন্দা। সে তার উদ্বেগ আর চাপতে পারে না। বলে, "সত্থবনের বাবা যে প্রতিবার এই রকম বিপদ মাথায় নিয়ে সমুদ্র-সফরে বেরোন, এটা ভাবতেও আমার ভয় করে।"

সত্থবন বললে, "আরে, জীবনটাই ঐরকম। তুমি গাঁয়ের গয়লাদের কথাই ভেবে দেখ না। গরুচোর, বাঘ, চিতা—সবরকম বিপদের মুখ থেকে গরু বাছুর বাঁচাতে গিয়ে তারা প্রাণ পর্যন্ত দেয়। 'প্রত্যেক গ্রামে 'বেরাক্কল' পাথর থাকে (বেরাক্কল মানে এক রকমের মন্ত্রপূত পাথর), মেয়েরা সেই পাথরে পূজো চড়ায়, পুরুষরা যাতে বিদেশ বিভুঁই থেকে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে, তার জন্যে মানত করে। রোজ অষ্টপহর, বারো মাস তিরিশ দিন মুক্তো ডুবুরীরা মরণ নিয়ে খেলা করে। তারপর ধর, করীর বাবার
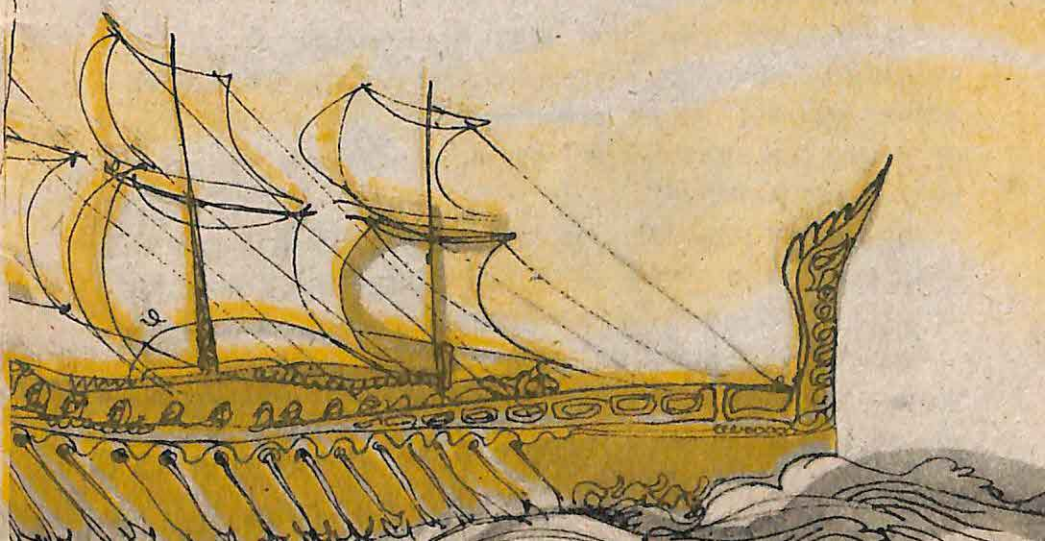
কথাই ধর না। বাঘ-হাতী শিকার করতে তাঁকে কী পরিমাণ বিপদের মুখে পড়তে হয়। করী নিজেই তো জানে, গাছে চড়ে টিয়াপাখির গর্তে হাত দেবার সময়ে যে কোন সময়ে কেউটে-গোখরো ফণা তুলে দাঁড়াতে পারে। বিপদের ভয় কোথায় নেই!" সে করীর মুখের দিকে চাইল, সে যদি একটু সহজ হয় এই আশায়। কিন্তু করী আগের মতই গুম হয়ে ঝিম মেরে রইল।

সত্যন বলে, "শহর সমৃদ্ধ হয়, যবনদের সোনায় মহারাজের রাজকোষ ভরপুর হয়।" বাকি সবাই তার কথায় ঘাড় নেরে সায় দেয়।

হঠাৎ করীর গলায় কর্কশ সুর বেরোয়, "রাজা অত সোনা নিয়ে কী করেন? ও সোনা আমাদের কী উপকারে লাগে?"

তার জবাব এলো সমস্বরে। "রাজার প্রথম কর্ত্তব্য রাজ্যকে রক্ষা করা। তিনি অন্য রাজার লোভ-লালসা থেকে, পাহারীদের হামলার হাত থেকে, আর গোধন তস্করদের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা করেন। তার জন্যে একটা জোরদার ফৌজ রাখতে হয়। ······রাজা শিলাকলার বড় মুরুব্বি। টিয়া পাখি যেমন ফলভরা গাছের দিকে ধেয়ে যায়, রাজ্যের কবিরা, গাইয়ে-নাচিয়েরা তেমনি করে রাজার কাছে ঝাঁক বেধে ছুটে যায়। ···রাজার উপবনে, বিদ্যাভবনে সাধুসন্ন্যাসী, জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতরা আশ্রয় পান।" তাছাড়া আছে উৎসব পর্বপার্ব্বণ, কুস্তি আর মল্লযুদ্ধ। এসব খেলা দেখে লোকে আনন্দ পায়।"

করী গোমড়া মুখে বললে, "চাষা, রাখাল আর শিকারীদের কী ব্যবস্থা?" সত্যন বললে, "শোন, যারা খাবার যোগান দেয়, সৎ রাজা কখনও তাদের অবহেলা করেন না। বড় বড় হাওদা তৈরী করানো, তার মেরামতী, বন কেটে আরও বেশি চাষের জমি তৈরী করানো, সরঞ্জামের বন্দোবস্ত—এইসব দিকে নজর থাকে রাজার।"

এরপর মজলিস ভেঙে গেল। বল্লুবর উঠে পড়ল, উঠে করীকে একহাতে জড়িয়ে ধরল। বলল, "আমি করীকে নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আমার মার কাছে যাব।" তারপর করীর দিকে ফিরে ভুলিয়ে ভালিয়ে বলল, "আমরা বাড়ীতে একটা ঝোপ লাগিয়েছি। মা তোমাকে একটু এসে দেখে যেতে বলেছেন, আর ঐ ঝোপে যে কাঁটা লেজওয়ালা পাখি আসে মা তোমার মুখে তার কথাও শুনতে চান।"

করীকে সমুদ্রের পার থেকে রাজার পুরী পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাটা ভিড় ঠেলে এগোতে হল। ওরা বাজারের মধ্যে দিয়ে বসত বাড়ির দিকে চলল। বিদ্যাভবন তো রাজার প্রমোদ-কাননের কাছাকাছি বল্লুবরের মা-বাবার একখানি সুন্দর ছোট্ট বাড়ি আছে। কাঠের বাড়ির চৌখুপী কাটা জানলায় হরিণের চোখের মতন ফুটো, (দারুময় প্রবেশ পথে কারুকার্যের সূক্ষ্মচাতুর্য্য) ঢোকবার পথে কাঠের দোর-বারান্দার গায়ে কাঠের ওপর কারুকাজের কারিকুরি। বল্লুবর করীকে চারদিক দেখতে বললে কোথায় নিখোঁজ হয়ে গেল।

সব অবস্থাটা বুঝে ফেলতে বল্লুর মায়ের বেশি দেরী হল না। তিনি বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে করীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। কিন্তু করী বললে, "দাঁড়ান, আগে আমি হাত মুখ ধুয়ে আসি।" মা হাসলেন। বল্লুবর করীকে বাড়ির পেছনে নিয়ে গেল। সেখানে মাটির বিশাল জলপাত্র, তার গায়ের রঙ মনজুড়োনো কাল আর লাল। করী, অঙ্গ থেকে ধুলোকাদা আর ঘাম ধুয়ে এল, তার মনে হল সেই সঙ্গে কিছুটা যন্ত্রণাও যেন ধুয়ে ফেলতে পেরেছে।

বল্লুবরের মা ছেলেদের সামনের দিকের বাগানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে একটা কাঠের আসনের পায়াগুলো কচ্ছপের খোলা আর রাণীমুক্তোর সাজে সাজানো। ইতিমধ্যে মা ঘরে এসে, দুই ছেলের জন্যে দুটি বড়

বাটিতে ঘোল নিয়ে এলেন। করী খুব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ঘোলটা পান করল। আর সেই সঙ্গে নরম পাকা কলাও ছিল, তাও খেল।

আঁচিয়ে উঠে ওরা দোরের সিঁড়িতে বসলে বল্লুবরের মা করীকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, "এমন ভেঙে পড়লে কি চলে বাবা! যবন বণিকরা পোষা পাখি ভালবাসে। তাদের ভাল করে খাওয়ায়। একবার এক যবন বণিক আমাকে একটা কবিতা শুনিয়েছিল। কবিতাটা লেখা হয়েছে একটা তোতা পাখিকে নিয়ে, পাখিটা ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

করী বলল, "বেশ তো, তার ইচ্ছে হয়ে থাকে, খুব সুন্দর সুন্দর টিয়াপাখি ডজন ডজন কিনে রাখুক না। কিন্তু আমার পাখিটা নিয়ে তার কী হল?"—

"তোমার তোতাকে তুমি এমন মিষ্টি করে কথা বলতে শিখিয়েছ যে, যবন বণিক ভেবেছে—তোতাপাখি তার রুগ্ন সন্তানকে আরাম দিতে পারবে।" মা বললে।

"কিন্তু তা কী করে হবে? আমার তোতা তো তার সঙ্গে আমার ভাষায় কথা কইবে। যবন ছেলের উপকার হবে কী করে?"—করীর আপত্তি।

"যে-তোতা মানুষের ভাষায় এতটা পারদর্শী, সে অন্য ভাষাও তাড়াতাড়ি শিখে নেবে।" বল্লুর মা জবাব দিলেন।

"তা ভাল। আমার মাণিক এখন থেকে ছেলেটার সঙ্গে তার ভাষায় কথা বলবে। সে খুশি হবে, আর আমি..." করীর গলায় তিক্ত সুর।

"এবার একথাটা ভাবো যে ছেলেটা বিছানায় পড়ে আছে, নড়তে পারছেনা। বনে যেতে, গাছে চড়তে, পাখি ধরতে, তোমার মতন কোনো কাজই সে করতে পারছেনা।" মমতার সুরে মা বলেন। করী কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনল। তারপ আবেগে ভেঙ্গে পড়ল, "বাবার কথা ভাবলে অবাক লাগে। একটা রুপোর টাকার জন্যে...। অথচ টাকা কি কেউ খায়?"

বল্লুবরের মা বললেন, "ছি বাবা, বাবার ওপর মনে রাগ পুষে রাখতে নেই। রাগ ঝেড়ে ফেল। এস এখানে আমি একটু বসি। বল্লুকে একটু এক জায়গায় পাঠাচ্ছি। ও ঘুরে এলে আমরা এমন গান করব, যে তোমার রাগ ধুয়ে মুছে যাবে।" বল্লুবরের মা আসলে করীর বাবাকে ডেকে আনার জন্যেই ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন, কারণ বল্লুবর নিশ্চিত, যে করীর বাবাকে সে সমুদ্রের পাড়ে ছেলের মতই মনমরা বিরস মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।

ভদ্রমহিলা তাঁর বীণাটি এনে, আস্তে আস্তে, কোমলহাতে তারে ঝঙ্কার

দিলেন। তিনি একটি গান গাইতে শুরু করলেন। গানটি একটা তোতা পাখীর গান। গান শুনতে শুনতে করীর রাগোদ্ধত মুখের ভাব নরম ও সহজ হয়ে এল। প্রথমে প্রায় অনিচ্ছায়, পরে অল্প অল্প হাসি মুখও দেখা গেল তার।

বালির চড়ায় একজন কালো, খাঁটো চেহারার লোক, ভাঙা মনে এদিক উদিক তাকাতে তাকাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মনে শান্তি বা সুখ ছিলনা। সেই সময় এরুক্কু মালা গলায় একটি ছেলে এসে তার হাত ধরে টানল। প্রশ্ন করল, "তুমি করীকে খুঁজছ? না? তুমি ভেবোনা। সে আমার বাড়িতেই আছে। আমার মা তাকে গান গেয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। তোতা হারিয়ে ও বেচারা বড় মুষড়ে পড়েছে।"

শিকারী অনেকটা যেন অনুশোচনার স্বরে বললেন—"আমি কী করব বল! একটা বুনো তোতার জন্য একটা লোক চাঁদীর টাকা দিতে চাইছে। ঐ টাকাটা পেলে আমি দুর্ভিক্ষের বছরের জন্যে সঞ্চয় করতে পারব। কিন্তু, এখন আর আমার ওসবে কী হবে। আমার করীকে তার মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে আমার কিসের ভাল-মন্দ। এই আজব সমুদ্র-পুরীতে কেবল জাহাজ আর মাল ভরাট মাল খালাস, আজগুবী কথা বলা মানুষ আর সর্বোপরি কানের ওপর দিনরাত জলের কলরব দেখতে দেখতে

শুনতে শুনতে আমার যেন সর্বস্বান্তের মতন লাগছে, কিছু ভাল লাগছে না।"

বল্লুবর তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "ভাববেন না, আমার মা করীকে বুঝিয়ে বলে আপনার সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন'খন। এখন তাড়াতাড়ি চলুন, আমাদের বাড়িতে কিছু খেয়ে তারপর বাড়ী যাবেন। আপনাদের বাড়িতো সেই বেনুকুঞ্জে।"

শিকারী সভয়ে বললেন, "দূর, তাই কী হয় বাবা! তোমার মা হলেন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা। আমার মত শিকারওয়ালা পাহাড়-চড়া ফালতু লোককে তিনি ঘরে ঢুকতে দেবেন কেন?" বল্লুবর বলল, "এই সম্ভ্রান্ত মহিলা ঢুকতে দেবেন। আপনি বরং এবার একটু পা চালিয়ে চলুন। তিনি আপনার জন্যেই বসে আছেন।"

বল্লুবর শিকারীকে নিয়ে, নদীর ধারে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে, তারপর পশ্চিম পাড়ার দিকে চলল। সারাক্ষণ তাকে কথাবার্তায় ব্যস্ত রেখে, নানারকম দিকচিহ্ন দেখিয়ে, বিমূঢ় শিকারী বেচারাকে বল্লুবর অবশেষে তাদের বাড়িতে নিয়ে এল।

বল্লুবরের মা করীর হাত ধরে বাইরে এলেন। গানে মতন, মৃদু মিষ্টি কণ্ঠে বললেন, "এস বাবা। তোমার জন্যেই বসে আছি। খিড়কির বাগানে করী কলাপাতা বিছিয়ে বসেছে। আমি ভাত, দই, আর লঙ্কার ঝোলের বন্দোবস্ত করেছি। এখনই বোসে পড়। দুটো মুখে দিয়ে নাও। তারপর বেরিয়ে পড়। পথ তো কম নয়। এই বেলা না বেরোতে পারলে, বাড়ি ফিরতে ঢের দেরী হয়ে যাবে। করীর মা দুশ্চিন্তা করবে।" ওরা বসল। বল্লুবরের মা ওদের পরিবেশন করলেন। ওদের পেট ভরে খাওয়ালেন। বল্লুবর সমানে গল্প করে গেল। বাগানের কাঁটা লেজ কাল পাখির কথা, পাহাড়ের কৃষ্ণসার হরিণের কথা, কত কথা যে সে জানতে চাইল, তার ইয়ত্তা নেই। করী এসব প্রশ্নের খুব সংক্ষেপে উত্তর দিল, কিন্তু তার বাবার মুখে রা নেই। সে যেন হতবাক হয়ে গেছে।

বিদায়ের আগের মুহূর্তে করীর বাবা গৃহকর্ত্রীর পায়ের ধুলো নিলো। তিনি বললেন, "আশা করি অন্ধকার হবার আগেই তোমরা যেন বাড়ি পৌছে যেতে পার।" তাঁর গলার সুরে আন্তরিক মমতা ও উৎকণ্ঠা ছিল। কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল শিকারী বলল—"আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না মা। আমার সঙ্গে মশাল আছে। জ্বালিয়ে নিলে আর জংলা জানোয়ার কাছে ঘেঁষবেনা।"

বাবা আর ছেলে নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগল।